এক

-ঘরটায় ঢুক্‌লেই মনে হ'ত সেটা একটা সাহেবের
নের খেল্‌নার প্রদর্শনী। বিশ্বকর্ম্মার মডেল্‌
র-ও তাকে বলা চলে। যেদিকে চাওয়া যায়
ত, কলকব্জা, লোহা আর কাঠের জঙ্গল। ঘরের
অধিকারী তাঁর হাত বিশ্বকর্ম্মার মতোই বিশ্বের
ছুতেই চল্‌ত। বিশৃঙ্খল ভাবে ঘরের চারপাশে
ার হয়ে আছে জাহাজের মডেল্‌, সেতুর নমুনা,
প্লেনের ক্ষুদে সংস্করণ, রেলের বামনাবতার, কাঠ
ার নতুন কলের করাত, মাটী খোঁড়বার যন্ত্র,
দ ইত্যাদি ইত্যাদি। আর ছিল হাতুড়ী, র‍্যাঁদা
া, করাত, বাটালি ও স্ক্রু-ড্রাইভার, আর যত কিছু
রের অস্ত্র-শস্ত্র বিশ্বকর্ম্মার সেবকদের জানা আছে।
বশেষ অভিনিবেশ সহকারে বছর তেইশের ছেলেটি
াদা কল-কব্জার মাঝে বসে' একটি নতুন কলের

লাঙ্গল পরীক্ষা করছিল। দরজার চৌকাটের ওপর থেকে একটি বছর চৌদ্দ-পনেরোর মেয়ে অনেকক্ষণ সেইদিকে চুপ করে' চেয়ে থেকে বল্লে—"বলি অধীর-দা, কথা কি কাণে যায় না নাকি? ছাইএর লাঙ্গল, দেব দূর করে' আস্তাকুঁড়ে ফেলে। মা যে দু'ঘণ্টা ভাত রেঁধে বসে' আছে সে খেয়াল আছে?"…ছেলেটি কোন উত্তর না-দিয়ে নিজের কাজ করে' যেতে লাগল। নীচে থেকে একজন বর্ষীয়সীর গলা শোনা গেল—"তুই চলে' আয় মা চারু, কোনোকালে যার হুঁশ হ'ল না আজ তুই কি তাকে তাড়া দিয়ে হুঁশ করাবি?" এইবার ছেলেটি কাজ থেকে মুখ তুলে হেঁকে বল্লে—"লক্ষ্মী মা, রাগ করো না, আর ঠিক পনেরো মিনিট, এই একটু সেরেই যাচ্ছি।" তারপর গলা নামিয়ে বল্লে—"এই চারীটা হয়েছে যত নষ্টের গোড়া। তোকে কে এখানে ফফরদালালী করতে ডেকেছে বাপু! চারী নয় ত একেবারে অশোকবনের চেড়ী।"

"আচ্ছা আচ্ছা, চেড়ীর ত ভারী দায় তোমায় খাওয়াবার জন্যে! চল্লুম আমি।" বলে' মেয়েটি উঠল।

এমন সময় বাইরে কে ডাকলে—"সুধীর, সুধীর-আছ?"

বাঁকা—লেখা

প্রেমেন্দ্র মিত্র
ও
অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান—বরদা এজেন্সী,
কলিকাতা।

নীচে থেকে বর্ষীয়সী আবার বল্লেন—"কে উৎপল? ভেতরে এস না বাবা!"

মেয়েটি যেতে উঠেও একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। বিলাতি জুতো মশ মশ করতে করতে গরদের পাঞ্জাবী পরা একটি সুশ্রী যুবক সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে বল্লে—"কি, সুধীর মিস্ত্রির কি এখনো ফুরসৎ হয়-নি?" তারপর মেয়েটির দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লে।

মেয়েটি ঈষৎ হেসে বল্লে—"নিন্, আপনার বন্ধুকে সাম্‌লান, আমায় ত গালাগাল দিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে বা'র করে' দিলেন শুধু খাবার বেলা বয়ে যাচ্ছে এই কথা বল্‌তে এসেছিলুম বলে'।"

আগন্তুক ছেলেটি জিজ্ঞেস কল্লে—"কি সুধীরের এখনো খাওয়া হয়-নি? আমাদের যে বারান্তরের তাগিদ এসে পড়েছে। কি রে, খেতে যাবি না?"

লাঙ্গলটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে সুধীর বল্লে—"শুন্‌লে মা, পেটুকের ইঙ্গিতটুকু বুঝলে ত!"

মা, সিড়ি দিয়ে ওপরে আস্‌তে আস্‌তে বল্লেন—"শুন্‌লুম, তোর হল?"

"হ্যাঁ হ'ল। নে চারী, ঘরটা গুছিয়ে রাখ্, আবার সেদিনকার মত কেলেঙ্কারী করে' বোস না যেন।

উইণ্ডমিলের মডেল্‌টা আমার গেছে একেবারে নষ্ট হয়ে! ওই কোন্ থেকে টেবল-ফ্যান্‌টা আস্তে আস্তে সরিয়ে সেখানে লাঙলটা রাখ্‌বি, দেখিস্ একটা পাখা আল্‌গা আছে।”

“আমি অত পারব না বাপু, তোমার যত ভুতুড়ে যন্ত্র ছুঁতে ভয় করে। সেদিন গেলুম প্যাঁট্‌রাটা সরিয়ে নতুন করে’ একটু সাজাতে, আর ওমা, এমন ‘শক্’ লাগ্‌ল হাতে!”

সুধীর হাস্‌তে লাগল। মা বল্লেন—“নারে চারু, তুই বাড়ী যা, পরের মেয়েকে রোজ-রোজ তুই ঘর গুছোতে হুকুম করবি কেন বল্ ত? আর রোজ-রোজ ওর ভালো লাগে?”

সুধীর চারুর দিকে চেয়ে বল্লে—“ওঃ, ওর খুব ভালো লাগে। দেখ না রোজ ঘর গুছোবার লোভে পালিয়ে আসে বাড়ী থেকে। কেমন রে চারী, ভালো লাগে না?”

মেয়েটির সুন্দর মুখটি লাল হয়ে উঠ্‌ল। উত্তর না দিয়ে সে চুপ করে’ দাঁড়িয়ে রইল। উৎপলের সঙ্গে একবার চোখোচোখি হওয়ায় আরো রাঙা হয়ে সে চোখ নামিয়ে নিলে।

মা হেসে বল্লেন—“তোর যত ক্ষ্যাপার মত কথা,

আচ্ছা এখন খেতে চ! এস বাবা উৎপল, আজ সেই রকম ডিমের বড়া করেছি, আয় চারু।"

উৎপল একটু দুষ্টু হাসি হেসে সুধীরের দিকে চেয়ে বল্লে—"আজ এইমাত্র খেয়ে এসেছি মা, পেটটা বড় ভার।"

"থাক্ না পেটুকরাম, আর ছলনায় কাজ কি! মার হাতের বড়ার নাম শুন্‌লে তোমার উদরে খাণ্ডবদাহনের ক্ষুধা জাগে, তাও যদি না জানতুম!"

সকলে হেসে উঠ্‌ল।

আজো সুধীরের সুস্থ সবল শ্যামবর্ণ শক্তিমান্ হাস্যদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে উৎপল কি-একটা পূর্ব্ব-পরিচিত স্মৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে বিফল হল। তার নাতি-দীর্ঘ পেশী-বহুল শক্তি-ব্যঞ্জক দেহে, কালো কোঁকড়া চুলের তলায়, উদার ললাটের নীচে ছোট-ছোট উজ্জ্বল চোখ দুটি কাফ্রী ধাঁচের চাপা বসা নাক ও চোখ ও নাকের সম্পূর্ণ বিপরীত একেবারে নারীর মতো সুকুমার পাত্‌লা ছোট ঠোঁট্—কি যে তার মনে করিয়ে দিতে চাইত, উৎপল ভালো করে' এখনো বুঝ্‌তে পারত না। সে হাস্‌লে তার দৃঢ় চিবুকের দু-পাশে নারীর মতো মোলায়েম গালের টোল্ পড়্‌লে সাদৃশ্য আরো পরিস্ফুট ও স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ত।

উইণ্ডমিলের মডেল্‌টা আমার গেছে একেবারে নষ্ট হয়ে! ওই কোন্‌ থেকে টেবল-ফ্যান্‌টা আস্তে আস্তে সরিয়ে সেখানে লাঙ্গলটা রাখ্‌বি, দেখিস্‌ একটা পাখা আল্‌গা আছে।"

"আমি অত পারব না বাপু, তোমার যত ভুতুড়ে যন্ত্র ছুঁতে ভয় করে। সেদিন গেলুম প্যাট্‌রাটা সরিয়ে নতুন করে' একটু সাজাতে, আর ওমা, এমন 'শক্‌' লাগ্‌ল হাতে।"

সুধীর হাস্‌তে লাগল। মা বল্লেন—"নারে চারু, তুই বাড়ী যা, পরের মেয়েকে রোজ-রোজ তুই ঘর গুছোতে হুকুম করবি কেন বল্‌ ত? আর রোজ-রোজ ওর ভালো লাগে?"

সুধীর চারুর দিকে চেয়ে বল্লে—"ওঃ, ওর খুব ভালো লাগে। দেখ না রোজ ঘর গুছোবার লোভে পালিয়ে আসে বাড়ী থেকে। কেমন রে চারী, ভালো লাগে না?"

মেয়েটির সুন্দর মুখটি লাল হয়ে উঠ্‌ল। উত্তর না দিয়ে সে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। উৎপলের সঙ্গে একবার চোখোখোখি হওয়ায় আরো রাঙা হয়ে সে চোখ নামিয়ে নিলে।

মা হেসে বল্লেন—"তোর যত ক্ষ্যাপার মত কথা,

আচ্ছা এখন খেতে চ! এস বাবা উৎপল, আজ সেই রকম ডিমের বড়া করেছি, আয় চারু।"

উৎপল একটু দুষ্টু হাসি হেসে সুধীরের দিকে চেয়ে বল্লে—"আজ এইমাত্র খেয়ে এসেছি মা, পেটটা বড় ভার।"

"থাক্ না পেটুকরাম, আর ছলনায় কাজ কি! যার হাতের বড়ার নাম শুন্‌লে তোমার উদরে খাণ্ডবদাহনের ক্ষুধা জাগে, তাও যদি না জানতুম!"

সকলে হেসে উঠ্‌ল।

আজো সুধীরের সুস্থ সবল শ্যামবর্ণ শক্তিমান্ হাস্যদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে উৎপল কি-একটা পূর্ব্ব-পরিচিত স্মৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে বিফল হল। তার নাতি-দীর্ঘ পেশী-বহুল শক্তি-ব্যঞ্জক দেহে, কালো কোঁকড়া চুলের তলায়, উদার ললাটের নীচে ছোট-ছোট উজ্জ্বল চোখ দুটি কাফ্রী ধাঁচের চাপা বসা নাক ও চোখ ও নাকের সম্পূর্ণ বিপরীত একেবারে নারীর মতো সুকুমার পাত্‌লা ছোট ঠোঁট্—কি যে তার মনে করিয়ে দিতে চাইত, উৎপল ভালো করে' এখনো বুঝ্‌তে পারত না। সে হাস্‌লে তার দৃঢ় চিবুকের দু-পাশে নারীর মতো মোলায়েম গালের টোল্ পড়্‌লে সাদৃশ্য আরো পরিস্ফুট ও স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ত।

দুই

দুটো বাড়ী রাস্তার দুইপারে বহুকাল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক এই দুই পরিবারের মতোই প্রীতির সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে। দুটো পরিবারের যেমন, দুটো বাড়ীর মধ্যে তেমনি বাহ্যিক পার্থক্য অনেক ছিল। সাম্‌নে বিলিতি ফুলের বাগান দেওয়া লাল প্রাসাদোপম ইমারৎএর সাম্‌নে যেমন ভাঙা পুরোণো দোতালাটা মানাত না, অত বড় বনেদী জমিদারের সঙ্গে সামান্য ভুইফোঁড় জজকোর্টের প্রায়-ব্রীফ-হীন উকিলের পরিবারের ঘনিষ্ঠতাও সাধারণের চক্ষে তেম্‌নি বেমানান্ বলতে পারা যায়। তবু ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং যেদিন জজকোর্টের দরিদ্র উকিল রামমোহনবাবু মাত্র কয়েক হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ও এই পৈতৃক দোতলাটি স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রের ভরণপোষণের জন্য রেখে কোন্ অজানা আদালতের শমন তামিল করতে প্রয়াণ করেছিল,

সেদিন থেকেও এই ঘনিষ্ঠতা শিথিল হবার কোনো লক্ষণ দেখা যায়-নি অন্ততঃ এই দুই পরিবারের স্ত্রী-অধিবাসীদের দিক থেকে। দুই পরিবারের প্রীতির সম্বন্ধের সূত্রপাতই স্ত্রীলোকদের মধ্য দিয়ে। চারুলেখার মা ও সুধীরের মা ছেলেবেলায় একই পাড়ায় দুই সই ছিলেন। অনেক 'বেলফুল' বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায়, কিন্তু তাঁদের এ পর্য্যন্তও যায়-নি।

চিত্রলেখা ও চারুলেখার বাপ বিদ্গাঁওএর জমিদার অন্নদাবাবু ছিলেন শিক্ষিত জ্ঞান-সন্ধানী ও কলা-রসিক,—সেকালের সাধারণ অধিকাংশ জমিদারের মতো বিলাসী মাংসপিণ্ড ছিলেন না। যে যুগে উপসর্গ না থাকলে জমিদারের সম্মান হত না, সেই যুগেই তিনি যে উপসর্গের লোভ কাটিয়ে উঠ্তে পেরেছিলেন এটা একটা প্রশংসার কথা। বংশানুক্রমিক ভোগ-বিলাস-জাত শরীরের ও বুদ্ধিবৃত্তির আলস্য তাঁর যে একেবারে ছিল না তা নয়, তবে সে আলস্য তাঁকে শুধু কঠিন দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্যেই বিমুখ করে তুলেছিল, ইতর ভোগ-বিলাসে ডুবিয়ে রাখ্তে পারে-নি। তিনি প্রথমে পিতৃ-পিতামহের মতো গোঁড়া হিঁদুয়ানীরই পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু যখন বড় মেয়ে চিত্রলেখা বিবাহের ছ'মাস পরে এগার বছর বয়সে

থান পরে' ঘরে ফিরে এসেছিল, সেদিন তিনি সংস্কার জলাঞ্জলি দিয়ে দু'বৎসরের মধ্যে আয়োজন করে আবার নতুন করে' মেয়ের বিয়ে দিতে পেছ-পাও হন-নি। সমাজ তাঁকে ত্যাগ কর্‌লে তিনিও এবার ক্রুদ্ধ হয়ে সমাজকে ত্যাগ করে' ৪৫ বৎসর বয়সে সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নিলেন। এতদিন তাঁদের সংসার যে-রকম চল্‌ত, এই ব্রাহ্ম হওয়ায় সেই রীতি-নীতির কোনো পরিবর্ত্তন কিন্তু হল না, সেই রকমই চল্‌তে লাগল।

চারুলেখা মানুষ হয়েছে এই ব্রাহ্ম-দীক্ষা ও হিন্দু-শিক্ষার আবহাওয়ায়। এখানে ছিল উদার আধুনিক-সংস্কার বর্জ্জিত চিন্তা-প্রণালী ও প্রাচীন বহুযুগের স্মৃতি-সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার আচার-নীতি।

অন্নদাবাবু চিত্রলেখার বেলায় একবার ঠকেছিলেন, এবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন চারু উপযুক্ত বয়সের না হ'লে আর বিয়ে দেবেন-না তার। যারা বার বছরে বিবাহ না-দেওয়ার পরিণাম সম্বন্ধে তাঁকে অচেতন কর্‌বার জন্য সচেষ্ট হ'ত, তাঁদের তিনি বল্‌লেন শুধু,—"আজ তো আর মানুষ শুধু দেহ-সর্ব্বস্ব নয় যে তার দেহের ইঙ্গিতে সমস্ত কর্ত্তব্য নিরূপণ কর্‌তে হবে। বার বছরের মেয়ের দেহের পরিণতি হয় বটে আমাদের দেশে, কিন্তু

শুধু দেহের সঙ্গে ত দেহের বিয়ে দিই না আমরা, মন আছে, বুদ্ধি আছে। শুধু দেহের পরিণতি হলে ত চল্‌বে না, মন বুদ্ধির পরিণতি না হলে চল্‌বে কেন ?"... এ-কথা আট বছর আগে তিনি নিজেই অপরের মুখে শুন্‌লে হয় ত হেসে উড়িয়ে দিতেন, কিন্তু তাঁর বড়মেয়ের বিধবা মূর্ত্তি তাঁর মনকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়ে অনেক নতুন জিনিষ দেখার সুযোগ করে দিয়েছিল। তা না হ'লে বার বছরের মেয়ের ভেতর শৈশবের প্রভাব বার বছরের ছেলের চেয়ে বিশেষ কিছু কম থাকে না, এবং সে শৈশবের স্বাধীনতাকে বন্ধনের মধ্যে থর্ব্ব করা যে ভয়ানক নিষ্ঠুরতা, এ-কথা কি তিনি আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌তেন তাঁর চারুলেখাকে দেখে ? তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা যে এই সামান্য জিনিষটি দেখতে পান-নি, তা তাঁরা হৃদয়-হীন ছিলেন বলে' নয়, শুধু তাঁরা বার-বছরের মেয়েকে স্বাধীন ভাবে দেখ্‌বার অবকাশ পান-নি বলে'ই। তিনি বুঝ্‌তে পেরেছিলেন জীবনের অনেক নির্ব্বিচারে মেনে-নেওয়া সত্য, ধারণা ও আচার, নতুন দৃষ্টির আলোকে যাচাই করে নেওয়া দর্‌কার। আজ তাঁর অধিকাংশ সময় যেত সেই কাজেই।

মেয়ে-মানুষ নিজে যা জানে বলে এবং যা জানে

বলে' জানে, তার চেয়ে অনেক সময় অনেক বেশী জানে। পুরুষকে যেন সত্য বাইরে থেকে সংগ্রাম করে' করে' সঞ্চয় করতে হয়, আর নারীকে যেন তা ভেতর থেকে নাড়া দিয়ে মুক্ত করতে হয়। তাই পুরুষ নতুন সত্য জয় করবার আনন্দে উল্লসিত হয়ে' যখন উন্মত্ত হয়ে ওঠে, নারী ধীরে ধীরে অতি সহজে তার সত্যকে ব্যক্ত করে, স্থির হয়ে থাকে। পুরুষ নতুন সত্যের নতুনত্বে চম্‌কে ওঠে, নারীকে কেউ নতুন সত্য জানিয়ে চম্‌কাতে পেরেছে কি? অন্নদাবাবুর স্ত্রী স্বামীর এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে বিস্মিত বা বিচলিত হন-নি, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মত গ্রহণ করবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা না থাক্‌লেও তার মূল কথা তাঁকে চেষ্টা করে' বোঝাতে হয়-নি। তিনি পুরুষের সাম্‌নে এখনও সহজভাবে বা'র হতে পারতেন না এবং কোথাও যেতে হলে জুতো পরতে পারতেন না এবং তাঁর বাড়ীর রীতি-নীতিতে সাবেকের চালই বজায় রেখেছিলেন, তবুও তাঁর সঙ্গে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা কোনো মহিলাই আলাপ করে' বল্‌তে বাধ্য হ'তেন যে বাংলার নারীর আদর্শের পথ এই রকম সমন্বয়ের ভেতর দিয়েই।

তিন

ছেলেবেলা যখন আর সব ছেলে লাট্টু ঘোরাত তখন সুধীর লাট্টু তৈরী করত এবং খেলাঘরের ইঞ্জিন দম্ দিয়ে চালিয়ে যখন সকলে আনন্দ করতে চাইত তখন সুধীর চাইত সেটাকে ভেঙে দেখ্‌তে। ছেলেবেলা তার বাবার বিচিত্র ঘড়ির কল-কব্জার রহস্য উদ্ধার করবার গোপন চেষ্টায় ধরা পড়ে' সে যে কতবার বকুনি ও মার অম্লান মুখে সহ্য করেছে তার ঠিক নেই। স্কুলে ধনী বন্ধুদের দামী বিলিতি ফাউণ্টেন্-পেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার থার্ম্মমিটারের খোলে তৈরী অদ্ভুত পেন্ দিয়ে লিখ্‌তে সে ঢের বেশী গৌরব অনুভব করত। বড় হলে সে ছুটীর অবসর কাটিয়েছে মোটরের কারখানায়, ষ্টীমারের অন্দরে, খাবারের পয়সায় কিনেছে যন্ত্র-পাতি লোহা-লক্কড়, নভেলের বদলে পড়েছে দুর্ব্বোধ্য Mechanics। জড়-যন্ত্রের সে ছিল কালোয়াৎ, অনন্ত শূন্যে অপরূপ ভঙ্গীতে গ্রহ-তারা

যিনি ঘুরিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন, প্রাণের কার্‌খানার সূক্ষ্মের ভেতর অতিসূক্ষ্ম ধারণাতীত নির্ম্মাণ-কৌশল যাঁর, সেই বিশ্বকর্ম্মার সে ছিল তান্ত্রিক পূজারী। প্রাণহীন জড়ের বাণী সে বুঝি শুন্‌তে পেয়েছিল, সে তাই বাঁধ্‌তে চাইত জড়ের ছন্দ, যন্ত্রের সঙ্গীত। যন্ত্রের সঙ্গীতে মানুষের আর্ত্তনাদ তখনও সে শুন্‌তে পায়নি।

তার যন্ত্র-ভরা ঘরে উপদ্রব না থাক্‌লে সে সমস্ত দিন-রাতই সেখানে কাটিয়ে দিতে পার্‌ত। তার এই যন্ত্র-সাধনার সহায় ও উপদ্রব দুই-ই ছিল চারুলেখা আর তার মা ছিলেন নীরব উৎসাদাত্রী। ছেলের এই যন্ত্রের নেশায় তাঁর নিজের অনভ্যস্ত মন সাড়া দিতে পার্‌ত না বটে, কিন্তু ছেলেকে তার অভীষ্ট পথ থেকে বিচলিত না-করার সমীচীনতা বোঝ্‌বার ক্ষমতা তাঁর ছিল। চারুকে সুধীর ছেলেবেলায় অনেকবার অনেক রকমারী অদ্ভুত পুতুল উপহার দিয়ে বাধিত করেছে। এই যন্ত্রের যাদুকরের প্রতি সেই ছেলেবেলা থেকেই চারুর একটা গোপন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম ছিল। যে অনায়াসে কোন অজ্ঞাত যাদুবিদ্যার বলে অবিশ্রান্ত অঙ্কেপকারী শিশু বা দোদুল্যমান হনুমানের মতো অদ্ভুত পুতুল তৈরী করে' ফেলে অতি সহজেই তা দান করে' ফেল্‌তে পারে, তার

প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম কোনো ছেলে মানুষের মনে উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বয়সের সঙ্গে যাদুবিদ্যা আর যাদুবিদ্যা না থাকলেও শ্রদ্ধা সম্ভ্রম নষ্ট হয়নি। চারুর ভালো লাগ্‌ত ওই অদ্ভুত যন্ত্রপাতির জগতে বেড়াতে এবং ওই যন্ত্রের পূজারীর পূজার আয়োজনে সাহায্য করতে।...

দুপুর থেকে সুধীরের মনটা ভালো ছিল না। তার নিজের তৈরী উন্নত ধরণের কলের লাঙ্গলের গোটা কতক ক্ষুদ্র ত্রুটি নিরাকরণের চেষ্টায় বার বার বিফল হয়ে। চারু দরজার পাশে চৌকাটে বসে' একটা ইংরাজি ছবির বইয়ের পাতা উল্টাতে-উল্টাতে তার অধীরদার এই অধীরতা লক্ষ্য করে' ক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্‌ছিল। খানিকক্ষণ আরো গোটাকতক পাতা অন্যমনস্ক ভাবে উল্টে সে বল্লে,—"আজ আর হবে না অধীরদা, তোমার মাথা ঠাণ্ডা নেই।" সুধীর কোন কথা না বলে' একটা বইএর পাতা খুলে পড়্‌তে লাগ্‌ল। খানিকক্ষণ বাদে বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস কল্লে—"সেদিন যে-বইগুলো গুছোতে বলেছিলুম, সেগুলো কোথায় রেখেছিস্?"

"কেন, ওই টেবিলের ওপর।"

খানিকক্ষণ টেবিলটা হাত্‌ড়ে বিরক্ত হয়ে সুধীর

বল্লে—"কি যে আমার মাথামুণ্ডু করিস্ তা বুঝি না। কোথায় গেল বই ?"

ক্ষুণ্ণস্বরে চারু বল্লে—"বা, আমি যত্ন করে' রাখি বলে' আমার ওপর যত তোড়! যা বই দিয়েছিলে, ওইখানেই ত রেখেছিলুম।"

"রেখেছিলুম ত গেল কোথায় ? তোকে রোজ যত বলি তুই আমার জিনিষ-পত্র ঘাঁটিস্‌নি, তুই ততই ঘাট্‌বি। দূর ছাই…" সুধীর বইগুলো মেঝেয় ছড়িয়ে ফেলে ঘরের চারধারে খুঁজতে আরম্ভ করলে।

সমস্ত বইগুলো সযত্নে তুলে টেবিলে সাজিয়ে রেখে চারু বল্লে—"বইগুলো এ-রকম করে' ছড়িয়ে ফেল্‌লেই কি বই পাওয়া যাবে ? কিবই হারিয়েছে শুনি, নাম কি ?"

"তুই বুঝবি নাম বল্লে ?"

"না বুঝি, খুঁজে বার করতে পারব তো !"

"যা, তোকে আর খুঁজে বার কর্‌তে হবে না, তোর জ্বালাতেই ত সব হারায়।"

এবার একটু রেগে চারু বল্‌লে—"বেশ, বই হারালেই আমায় খোঁটা, আমার ত আর ঘরে ভাত জোটে না, তাই তোমার চাকরাণী-গিরি করতে আসি। এই কোণে পড়ে' আছে এটা কি বই ?"

চাকরাণীর কথায় সুধীর বই খোঁজা ছেড়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বেশ একটু বড় গলায় বল্লে—"চাকরাণী নস্ ত তোকে আস্তেও ত কেউ ডাকে না।"

চারুর দু-কান রাঙা হোয়ে উঠ্ল কিন্তু তপস্যা-নিরত সুধীর তা দেখ্তে পেলে না, যেমন সে দেখ্তে পায়নি সেদিনের শিশু চারু আজ আসন্ন-যৌবনা কিশোরী হয়ে উঠেছে।

চারু মুখের কথা চেপে বল্লে অতি শান্ত স্বরে—"আচ্ছা, আর আস্ব না।" এ শান্তস্বরে যন্ত্র-তান্ত্রিক সুধীর ছাড়া বুঝি সকলের ভুল ভাঙ্ত। কিন্তু ভাগ্যের বিদ্রূপ তখনও শেষ হয়নি, কোণের বইটা তুল্তে গিয়ে একটা হাল্কা ক্রেণের মডেল্ পড়ে' ভেঙে গেল।

সুধীর দাঁত খিচিয়ে বল্লে,—"ভাঙ্লে ত, ভেঙেছ ত!" তারপর কোণ থেকে বইটা তুলে নিয়ে বল্লে—"যাও, আর এ ঘরে ফফরদালালী কর্তে হবে না, অলক্ষ্মী কোথাকার!"

এ রকম ঝগ্ড়া তাদের আরো অনেকবার হয়ে গেছে।

কিন্তু সেদিন ঠিক এমনি সময়টাতেই ঘরে ঢুকে উৎপল বল্লে—"কি সুধীর, কি হচ্ছে?"

সুধীর তখন চীৎকার করে' বল্‌ছিল,—"যা, তোকে আর ওস্তাদি কর্‌তে এ ঘরে আস্‌তে হবে না।"

উৎপল অবাক হয়ে অশ্রু-ভারাক্রান্ত চারুলেখার চোখের দিকে করুণ ভাবে চাইতেই কোনমতে দুর্দ্দমনীয় অভিমানের অশ্রু দমন করে' চারু তার প্রথম যৌবনের প্রথম নিদারুণ অপমান বুকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তপস্যান্ধ সুধীর তার কিছুই জান্‌তে পার্‌ল না।

চার

কালো ভারী একটি মেঘের মতো পায়ের গতিটা ভারী করে' চারুলেখা নীচে চলে' গেলে উৎপল খানিকটা খোলা দরজাটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর যন্ত্র-তপস্বী সুধীরের মাথাটা একবার নেড়ে তার অভিনিবেশ চম্‌কে দিয়ে সে তিক্তকণ্ঠে বল্লে,—"কি হয়েছে তোর আজ? মাথা ঠিক নেই নাকি রে?"

সুধীর চড়া গলায় বল্লে,—"দেখিস্‌-না দুপুর থেকে পিছু লেগে আছে, এমন করলে কি আর কাজ এগোয়? গেল ক্রেণের মডেল্‌টা ভেঙে!"

উৎপল চারুলেখার সেই ব্যথা-ভারাতুর সজল চোখের দৃষ্টিটি মনে ক'রে নরম গলায় বল্লে—"তার জন্যে এমন করে' বকতে হয়?"

সুধীর রুখে উঠে বল্লে—"যা যা তোর আর দরদ্‌ দ্যাখাতে হবে না। যা এখন নীচে, মা ডাকছেন হয়ত।"

উৎপল বল্লে—"মা আমাকেই খালি ডাকছেন না, তোকেও, চল্ বেড়ে লুচি ভাজার গন্ধ বেরুচ্চে।"

"খাণ্ডবদাহ জ্বলেছে বুঝি? তা যা, আমার ভাগেরটা তোকে স্বচ্ছন্দচিত্তে দিয়ে দিলুম; মাকে গিয়ে বল্ আমি ওই ভাঙা মডেল্‌টা জোড়া না-দিয়ে আর উঠ্‌ছিনে।" বলে' তার অর্দ্ধভগ্ন যন্ত্রটার ওপর সে আরো গভীর মনোযোগে ঝুঁকে পড়্‌ল।

উৎপল তার সুমুখ থেকে গুছানো যন্ত্রগুলি এলোমেলো করে' দিয়ে বল্লে—"তুই আজ বেরুবি না নাকি বেড়াতে? মাথা যে বিগড়ে যাবে একদম্।"

সুধীর বিরক্ত হয়ে বল্লে—"তোদের মতন হাওয়া খেয়ে সময় নষ্ট কর্‌বার মতন সময় আমার নেই। যা আর জ্বালাস্ নে।"

উৎপল আর কিছু না বলে' একটু এগিয়ে সুধীরের টেবিলের পাশের বন্ধ জান্‌লাটা খুলে দিয়ে শান্ত আবেগ-ভরা কণ্ঠে বল্লে,—"ত্থাখ্ কেমন সুন্দর সন্ধ্যা হয়েছে!"

সহসা সুধীর চীৎকার দিয়ে উঠ্‌ল—"শীগ্‌গির বন্ধ করে' দে জান্‌লা, এখুনি হাওয়ায় আমার সমস্ত শিশি ভেঙে গুড়িয়ে যাবে। এই গেল কাগজগুলি উড়ে, সমস্ত experiment ভেস্তে গেল!..."

উৎপল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তখুনি জান্‌লাটা বন্ধ করে' দিলে, গোধূলি আকাশের সেই বিদায়-ব্যথা-ম্লান ধূসর ঔদাস্যটি তার বুকে এসে বাজ্‌ল। সে গম্ভীর কণ্ঠে বল্লে—"ওরকম ভাবে থাক্‌লে দু-দিনে মরে' যাবি।"

"তবু তোদের মতন ফুলেল্ হাওয়ার বাণ খেয়ে নিত্য নিত্য মর্‌ব না। যা ফুল্‌কো লুচি খা গে যা নীচে।"

উৎপল আর কথা না বলে' ধীরে ধীরে নীচে চলে' গেল।

রান্নাঘরের বারাণ্ডায় একটা জলচৌকীর ওপর বসে' মা ষ্টোভে লুচি ভাজ্‌ছিলেন, আর চারু দুটি কাঁসার রেকাবীতে তা পরিপাটী করে' গুছিয়ে রাখ্‌ছিল। জুতোর আওয়াজ শুনতেই মা মুখ না ফিরিয়েই বল্লেন—"কে বাবা উৎপল এলে,বোস। দে ত মা চারু একটা আসন পেতে।"

উৎপল আসনের অপেক্ষা না করে'ই একেবারে মার পা ঘেঁষে মাটিতে বসে' পড়্‌ল। চারু আসন এনে মিষ্টি একটু হেসে বল্লে—"মাটিতে বসে' পড়্‌লেন যে, উঠুন, পাঞ্জাবীটা একদম্ নোংরা হয়ে যাবে।"

"তা যাক্, বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে মা, নিই এই থালাটা।"

চারু আবার একটু মিষ্টি হেসে থালাটা উৎপলের সাম্‌নে এগিয়ে দিল। মা বল্লেন—"পাগ্‌লাটার বুঝি

এখনো হুঁশ হোল না উৎপল? তুই যাবি মা চারু একবার ডেকে নিয়ে আস্‌তে।" চারুর রাঙা মুখ মেঘ্‌লা-করা চাঁদের মতো কি রকম থম্‌থম্ করে' উঠ্‌ল উৎপল তা লক্ষ্য করলে। তাই বল্লে—"ও খাবে না বলে' দিয়েছে, খাবার ওর সময় নেই, ভাঙা ক্রেণ জোড়া না দিয়ে আর উঠ্‌বে না।"

মা একটু গৌরবের স্বরে বল্লেন—"একেবারে ভোলা হয়েছে ছেলেটা, যন্ত্রের কি নেশা যে পেয়ে বসেছে ওকে বুঝি না। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, মাঝরাতে উঠে কোনোদিন আলো জ্বালিয়ে বসে, আর বিড়্‌বিড়্ করে বকে। তুই যা না তবে চারু খাবারের থালাটা নিয়ে, মুখের সাম্‌নে ধরে দিয়ে আয়, বল্ গে মা দিলে, আমার কথা সে ঠেল্‌তে পার্‌বে না।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও চারু খাবারের থালাটা নিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেল। গিয়ে দেখ্‌লে ঘনিয়ে-ওঠা অন্ধকারে নীচু হয়ে বসে' তখনো সুধীর কাজ করে' যাচ্ছে। ঘরে ঢুক্‌বে না ভেবেছিল, খুকীর ফুঁপিয়ে-ওঠা কান্নার মতো একটি অভিমান তখনো তার বুকে গুম্‌রে উঠ্‌ছিল, তাই সে চৌকাটটা না পেরিয়ে মৃদু স্বরে ডাক্‌লে—"অধীরদা।" কিন্তু সে-স্বর তার কানে গেল

না। চারু ভাব্‌লে, থালাটা চৌকাটটার পারেই রেখে দিয়ে আসে, কিন্তু পাছে মা কিছু মনে করেন সেই ভেবে ঘরে ঢুক্‌ল। স্থধীর মুখ না তুলেই বল্লে—"আবার এসেছিস্ যে আমার ঘরে ?" টেবিলটার ওপর খাবারের থালাটা রেখে আব্‌ছা গলায় চারু বল্লে—"মা পাঠিয়ে দিলেন।" বলে' একবার স্থধীরের নিবিষ্ট কঠোর মুখের পানে চেয়ে দেখ্‌লে, তাতে কোনো কৌতূহল কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। এক মুহূর্ত্তের জন্য চারুর মন অভিমানে গুলিয়ে গুম হয়ে উঠ্‌ল। সে ঘূর্ণি-হাওয়ার মতো ছুটে গেল দ্রুতপদে, পেছন থেকে স্থধীর তখন ডাক্‌চে—"চারী, ও চারী, শোন্ পালাস্ নে।"

নীচে এসে চারু মাকে বল্লে—"এবার তবে যাই মা, সন্ধ্যে হয়ে গেল, সেই কোন্ দুপুরে এসেছি।"

মা বল্লেন—"যা, কার সঙ্গে যাবি, স্থধীর তো বুঝি আজ তার যন্ত্র ছেড়ে উঠ্‌বে না।"

চারু উৎপলকে লক্ষ্য করে' বল্লে—"উনিই তো আছেন। পারবেন না একটু এগিয়ে দিতে আমাকে ?"

উৎপল বল্লে—"হাঁ, আমিও তো এই বেরুচ্চি, চল।"

তখনো গ্যাস জ্বালা স্থরু হয়নি, স্বল্প অন্ধকারে সরু গলিটা একটা করুণ একতারার স্থরের মতো মায়াময় লাগ্‌ছিল।

সামান্য একটু খানি পথ এগিয়ে চারুকে তার বাড়ী পৌছে দিয়ে উৎপল বল্লে—"তবে আমি এখন যাই, লেখা।"

চারুলেখা গলার এই অপূর্ব্ব স্বরটি শুনে মনে মনে একটু চমৎকার রস অনুভব করলে, সেও তেমনি গলার স্বরটি অনুকরণ করে' বল্লে—"আসুন গে।"

চারু চলে'গেলে পর ওপর থেকে সুধীর চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"চারী, ও চারী, খাবার জল দিয়ে যাবি না বুঝি?"

মা বল্লেন—"দাঁড়া, নিয়ে যাচ্চি।" বলে' কাঁচের গ্লাস করে' ঠাণ্ডা জল নিয়ে মা হাজির হলেন ছেলের কাছে। ছেলে বল্লে—"চারী গেল কোথায়?"

মা জলের গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে বল্লেন—"বাড়ী চলে' গেছে।" সুধীর জলের গ্লাসটা স্পর্শ না করে' ফের যন্ত্রের দিকে বৃথা মনোযোগ দেবার চেষ্টা করে'আপনমনেই বলে' উঠ্‌ল—"যাক গে, আপদ গেছে।"

সেদিনকার অন্ধকার বিনিদ্র রাত্রির ক্লান্ত প্রহর গুণে গুণে অতিষ্ঠ হয়ে উৎপল ঘর থেকে পথে বেরিয়ে পড়্‌ল। নিথর নক্ষত্র-দীপ্ত অনন্ত রাত্রির রাগিণী তাকে উদাস করে' তুলেছে। ঘুমন্ত পথে সে যেন কার সন্ধানে বেরুল, দূরে কালো আকাশে তখনো উচ্চশির একটা চিম্‌নি প্রকাণ্ড দৈত্যের মতন কালো ধোঁয়া উদ্গীরণ কর্‌চে, একটা

মোটর বিকট আর্ত্তনাদ কর্‌তে কর্‌তে বেরিয়ে গেল। ঐ প্রচ্ছন্ন-রহস্য নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চেয়ে বারে-বারে তার মনে পড়্‌ছিল একটি রাঙা ডুরে শাড়ী-পরা লীলা-চঞ্চল কিশোরীর সেই অশ্রু-ভারাতুর দুইটি নয়নের সজল কান্তির ছবি! সেই বিশৃঙ্খল যন্ত্র-আস্‌বাবের ঘরে ব্যর্থ কল-কব্জার আয়োজনের মধ্যে একান্ত অসহায় দুঃখিনী মেয়েটির অশ্রু-উদ্বেল কাতর মুখের ছায়া! সে ভাব্‌ছিল তার সেই গানের সুরের মতো দোদুল গতিখানি, সেই কচি লতার মতো দুটি বাহু, সেই দুটি আরতি-প্রদীপের মতো চোখ! সেই চোখ মুখ ও বাহুর তলায় কত যন্ত্রের সাজ-সজ্জা, কত শিরা-উপশিরা, কত আয়োজন, কত কৌশল, কত সৃষ্টি চাতুরী, কিন্তু সবাইর ওপর বিশ্ব-শিল্পী এমন নয়ন-ভুলানো আবরণ রচনা কর্‌লেন কেন? কেন এই দেহ-যন্ত্র কোন্ অনাদি অসীম রহস্যের বার্ত্তা বহন করে' আনে? পৃথিবীর বুকের মধ্যে কত গলিত ধাতু, কত আগুনের কার্‌খানা, কিন্তু ভগবান তার ওপরে এই স্নিগ্ধ শ্যামলতার আঁচল টেনে দিলেন কেন? কেন নগ্ন আকাশের বুকে মেঘের লাবণ্য ঢেলে দিলেন? আদিহীন অন্তহীন রহস্য-সমুদ্র সেই শিল্পী যেন বল্‌চে—"ঢেকে দাও এই সব ব্যর্থ কুশ্রী যন্ত্রের উপাচার, সুন্দরের কল্যাণের

মাধুর্য্যের জয়ধ্বজা উড়ুক আকাশে !”...উৎপল গলির পর গলি পার হয়ে যাচ্ছিল, আর এই সব কথা ভাব্‌ছিল আবোল্ তাবোল করে। কোন্ একখানি অপরাজিতা ফুলের মতো নবীন স্নিগ্ধ মুখ তার বুকে প্রথম যৌবনের তোলপাড় লাগিয়েছে আজ এই রহস্য-ভরা পরিপূর্ণ রাত্রে !

পাঁচ

দুইদিন উপর্য্যুপরি একটা যন্ত্রের অদ্ভুত কৌশল উদ্ভাবন করতে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে সেদিন সন্ধ্যায় সুধীর একান্ত ক্লান্ত হয়ে ঈজি চেয়ারটায় শুয়ে পড়্‌ল। কাজ কর্‌বার সে যেন আর স্ফূর্ত্তি পাচ্ছিল না। ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ তার ঠাহর হোল এ-দুদিন চারু তার ঘরে আর আসেনি। নীচে কোনো সময়ে তার গলার স্বর বা চলার আওয়াজ সে শুনেছে কিনা তাও সে মনে করতে পার্‌লে না। মনে পড়্‌ল, সেদিন তাকে এ-ঘরে ঢুকে জিনিষ-পত্র নাড়া-চাড়া করার জন্য তিরস্কার করায় হয়ত চারু রাগ করেছে। ঘরের এই সৌষ্ঠবহীন বিশৃঙ্খল চেহারাটা সুধীরকে পীড়া দিচ্ছিল, এরা এ দুদিন কার দুটি তনু মঙ্গল হস্তের স্পর্শ-সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়ে ভাষাহীন জড়স্তূপের মতো নিষ্ঠুর হয়ে রয়েছে, তাই তারা এত চেষ্টাতেও এ-দুদিন একটুও সাড়া দিলে না তার এত ডাকাডাকিতে। এ যন্ত্র-

জগতের প্রাণ-স্পন্দনটি যেন থেমে পড়েছে। সুধীর ক্লান্ত দেহটাকে আরাম কেদারায় আর বিশ্রাম কর্‌তে দিলে না, তাকে বিপুল বেগে টেনে তুল্‌ল।

রাস্তার ধারে বৈঠকখানায় তক্তপোষের ওপর বসে' অন্নদা-বাবু শিথিল টানে গুড়্‌গুড়ি টান্‌ছিলেন আর তাঁর সুমুখে একটা হেলান্ দেওয়া বেঞ্চিতে বসে' চারুলেখার মা সুনয়নী দেবী স্বামীর কাছে ছোট মেয়ের বিরুদ্ধে নালিশ কর্‌ছিলেন। দক্ষিণ হাওয়াতে থেকে-থেকে লণ্ঠনের শিখাটা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল।

সুনয়নী বল্লেন,—"সারা দিন পাড়া বেড়াবে, লেখা-পড়া কাজ-কর্ম্ম কিছু নেই, ওকে নিয়ে তোমাকে ভবিষ্যতে মহা মুস্কিলে পড়্‌তেই হবে বলে রাখ্‌চি।"

অন্নদাবাবু অল্প একটু হেসে বল্লেন,—"ভবিষ্যতের ভাবনাটা এখন থেকেই ভাব্‌তে সুরু কর্‌লে লাভ হয় এই যে, ভাবনাটা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। আর আমাদের দেশের যত ভাবনা সব যেন এই মেয়েগুলোই একচেটিয়া আম্‌দানী করে সংসারে।"

সুনয়নী রুষ্টস্বরে বল্লেন—"তা বলে' মেয়েটা অম্‌নি উড়ে বেড়াবে নাকি ?"

"তা একটু বেড়াক্ না! প্রজাপতিগুলি যখন রঙ্-

চঙে পাখা মেলে লঘুছন্দে উড়ে বেড়ায়, কি-রকম চমৎকার দেখায় বলত! আমরা ওদের একটিবার প্রাণ খুলে হাসতে গাইতে চেঁচাতে দিই না, শাসন সংস্কারের আবর্জ্জনা দিয়ে ওদের ঘিরে শক্ত লোহার বন্দীশালা গড়ে' তুলি, তাই ওরা দিন-কে-দিন জীবন্মৃত জড় হয়ে পড়চে। কুড়িতেই বুড়ি বলে' প্রবাদটা খালি আমাদের মতন হতভাগ্য দেশেই চলে। বন্ধনহীন চঞ্চল আনন্দে যতদিন পারে ও উড়ুক না, তারপর যেদিন তার পাখার চাইতে প্রাণের ওজন ভারী হয়ে উঠবে…"

সুনয়নী কথার মাঝে কিসের একটি ইসারা পেয়ে স্বামীর কথার স্রোতে বাধা দিয়ে বল্লেন—"ওর বয়েস-টাতো আর কম হোলো না, পনেরোয় পা দিতে চলেছে, একটা পাত্র জুটোতেও তো সময় চাই।"

"ভাখ, মেয়েকে কাঁধের বোঝা বলে' মনে করে' তার থেকে রেহাই পাবার জন্য একবার চেষ্টা করে' ভীষণ ঠকেছিলে,সে-কথা ভুলে যেও না।…তা ছাড়া মেয়ের মনের আকাশে ফাল্গুনের নিমন্ত্রণ না-আসা পর্য্যন্ত আমাদের যে অপেক্ষা করতেই হবে। কচি গাছ নোয়ানো যেতে পারে বটে, কিন্তু নোয়াতে গেলে ভেঙেই যায় অধিকাংশ…"

হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়ার মতন সুধীর সে-ঘরে

দ্রুত পায়ে ছুটে এল। সুনয়নীকে সাম্‌নে দেখ্‌তে পেয়ে সে জিজ্ঞেস কল্লে—"চারু কোথায় মাসীমা ?"

সুনয়নী সন্ত্রস্ত হয়ে বল্লেন—"আজ আবার তোর কোন যন্ত্র ভেঙে দিয়ে এল নাকি ? এমন চঞ্চল হয়েচে মেয়েটা।"

সুধীর বল্লে—"না, কোথায় ও ? ওর সঙ্গে একটা দরকার আছে!"

সুনয়নী বল্লেন—"ছাতে গান গাইছিল তো শুন্‌ছিলুম..."সুধীর আর একমুহূর্ত্তও দেরী না করে' একদম্ বাড়ীর ভেতর চলে' গেল।

অন্নদাবাবু বল্লেন—"চমৎকার ছেলে এই সুধীর। কি একান্ত অভিনিবেশের সঙ্গে নিজের সব কাজ করে' যেতে পারে, তাতে কোনো ত্রুটি কোন বিচ্যুতির লেশ তার নেই। যেন যন্ত্র-সমুদ্র মন্থন করে' কোন্ অমৃত তুল্‌বার পণ করেছে।"

সুনয়নী চিন্তিত সুরে বল্লেন—"বেলফুল বলে ছেলেটা কেমন যেন দিল্‌ভোল্‌ নেশাখোরের মতন থাকে, রাত জাগে, খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে কেবল কল-কব্জার ছিনিমিনি, কেবল ঝন্ ঝন্ লোহার হাতুড়ির আওয়াজ, যেন একটা mania হয়ে গিয়েছে। শেষকালে মাথা খারাপ না হলে হয়!"

অন্নদাবাবু বল্লেন,—"ভালো, বাংলার পক্ষে এ একটা শুভ লক্ষণ। ভেতো বাঙালী কলম লিখে-লিখে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে। চাই-ত এই রকম একনিষ্ঠসাধক, বিজ্ঞানাচার্য্য তেজী পুরুষের দল। খালি কৃষিতে সারা ভারতের পেট ভরে না, কল-কারখানা-বন্দর বাণিজ্য তার চাই, বিদেশী সব ঐশ্বর্য্য তার লুট্ করে' নিলে। পশ্চিম নব নব সৃষ্টির পথে এগিয়ে চল্‌ল, আর আমরাই অলস অপটু দুর্ব্বলের মতো পিছিয়ে রইলাম চিরদিন। চমৎকার শুভলক্ষণ এ, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি।"

তখন নির্জ্জন অন্ধকার ছাতে একলা একটা রেলিং ধরে চারুলেখা পথের পানে চেয়ে ছিল। তিমিরাচ্ছন্ন আকাশে গ্রহ-তারকায় কোন্ বেহাগের কানাকানি চলেছে, তার একটি রেশ্ যেন এই কিশোরীর নূতন-বাঁধা প্রাণ-বীণার তারে মৃদু-মৃদু বাজ্‌ছিল। সুধীর ছাতে উঠে অন্ধকারে চারুকে দেখে সাম্‌লে নিয়ে ডাক্‌লে—"চারু!" এমন সময় এই সন্ধ্যালোকে মুখ দিয়ে চারু নামের অভ্যস্ত বিকৃত ধ্বনিটা যেন বা'র হতে পার্‌ল না। চারু চম্‌কে পিছন ফিরে দাঁড়াল। সুধীর এগিয়ে এসে শুধালে—"আমাদের বাড়ী আর যাস্‌নে যে?"

চারু চোখ্ নীচু করে' বল্লে—"যাই তো।"

"কৈ, আমার ঘরে তো তোকে আর দেখি না।"

এবার চারুর গলার স্বর কেঁপে উঠ্‌ল, একটু রুক্ষ কণ্ঠে সে বল্লে—"যে ঘর থেকে তাড়িয়ে ছায়, চাকরাণী বলে, আমি তার ঘরে যাই নে।"

এর ভেতরে চারুর না যাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে সুধীর প্রথমে কিছু বুঝ্‌লে না, তাই বল্লে—"তাড়িয়ে দিলেই বুঝি তাড়িয়ে দেওয়া হল! চাকরাণী বল্লেই বুঝি চাকরাণী হয়ে যায় লোকে! আমার ঘরে বুঝি আর তার জন্যে ঝাট পড়্‌বে না, ধূলোতে সব বুঝি কদাকার হোয়ে থাক্‌বে! বারে!"

"তা আমি কি জানি?"

সুধীর এ রহস্যের কিছু মীমাংসা কর্‌তে পার্‌লে না। চারু রাগ করে' তার ঘর গুছোতে যাবে না, এ-কথার মানে আয়ত্ত কর্‌বার মতন শক্তি তার ছিল না। তার কান্না পাচ্ছিল।

সে কান্নার সুরে বল্লে,—"তবে ঐ ধুলো-বালির মধ্যেই আমি শোব বুঝি?"

চারু কোনো কথা কইল না, রেলিংটার ওপর চোখ্ রেখে চুপ করে' রইল। তার দুই চোখের পাতা ব্যথার

তন্দ্রায় ভারী হয়ে উঠ্‌ছিল। সুধীর বুঝ্‌লে না যে এই যৌবনের ডাক-শোনা কিশোরীটির বুকে আত্মসম্মানেরও আমেজ লেগেছে, তাই সেদিনের উৎপলের সুমুখে নিদারুণ নিষ্ঠুর অপ্রত্যাশিত অপমানটা গুমোটের মতো তার সমস্ত বুক এঁদো ভারী করে' তুলেছে,—একে সে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পাচ্ছে না।

সুধীর খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে, তবুও চারু এলো না দেখে রুক্ষ স্বরে বল্লে—"আস্‌বি না তো, বেশ, তবে ধুলোতে শুয়ে আমার অসুখ হোক্‌! তখন দেখ্‌ব কেমন না আসিস্‌। ঠিক, আস্‌বি না ?" বলে' গর্‌গর্‌ কর্‌তে-কর্‌তে সে বেরিয়ে গেল।

চারু তাদের দোতালার বারান্দা থেকে দেখ্‌তে পেলে অধীরদা একটা ঝাঁটা হাতে তাঁর ঘরের মেঝে টেবিল বই প্রভৃতি থেকে ধুলো ঝাড়ছেন, আর ঝাঁটার বাড়ি খেয়ে অসংখ্য শিশি ও মডেল্‌ মাটীতে পড়ে' ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে।...সে আর একমুহূর্ত্তও দেরী না করে' তেম্‌নি চপল ঝর্ণা-ছন্দিত গতিতে ছুটে চল্‌ল। সুনয়নী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন —"কোথায় যাচ্ছিস্‌ ?"

চারু অন্নদবাবুকে বল্লে—"তুমি একটু শোন না বাবা, অধীরদা-দের বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দেবে।"

সুনয়নী বল্লেন—"এই রাত হয়ে এল, ওখানে আবার কেন ?"

চারু কথার জবাব দিতে ইতস্ততঃ কর্‌ছিল, অন্নদাবাবু গুড়্‌গুড়ির নলটা ফেলে চটিটা পর্‌তে-পর্‌তে বল্লেন—"চল্ সুধীরদের বাড়ী।"

ছয়

নীচে মা ভাঁড়ারে হাঁড়ি-কুঁড়ি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সুধীরের অনাবশ্যক জোরে পা ফেল্‌বার শব্দে আশ্চর্য্য হয়ে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস্ কল্লেন,—"কি হয়েছে?"

সুধীর সপ্তমে চড়ে' বল্লে—"হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। আমার ঘরটা মাকড়সা ইঁদুর আর্‌শোলায় উচ্ছন্নে যাক্, ধূলোর বাজার হয়ে উঠুক, তবু সেদিকে কারুর দৃষ্টি নেই। এই যে তিনদিন বই গুছানো নেই, জিনিষ-পত্র সব খুঁজে পাই না—দূর হোক গে ছাই!" আপন মনেই বক্‌তে বক্‌তে সে সশব্দে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

মা অবাক্ হয়ে পেছন-পেছন গেলেন বল্‌তে বল্‌তে—"তুই কোনোদিন দিয়েছিস্ আমায় তোর ঘরে ঢুক্‌তে যে আজ আমার ওপর তম্বী কর্‌ছিস্! আমিও কি কখন্ ভেঙে যায় ভয়ে তোর ঘরে ঢুকি না।"

সুধীর কোনো কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে' ঘরের কোণ

থেকে ঝাঁটা তুলে নিয়ে ঘরের ভেতর যে-কাণ্ডটি বাধিয়ে তুল্‌লে তাতে হাসি চাপ্‌তে না পেরে মা তার হাত থেকে ঝাঁটাটা নিতে গিয়ে বল্লেন,—"নে ছাড়্, তুই ঝাঁট্ দিবি, তবেই হয়েছে!"

স্থধীর কিন্তু ঝাঁটাটা না ছেড়ে আরো রেগে বল্লে— "না তুমি যাও, এক্ষুনি তো সব ভেঙে চুরে ফেল্‌বে, আমার ঘর কাউকে ঝাঁট্ দিতে হবে না।"

তারপর অপটু হাতের ঝাঁটার তাড়নে ধূলো উড়ে জিনিষপত্র পড়ে' যে অপরূপ কুরুক্ষেত্র আরম্ভ হ'ল, তার নীরব দর্শক ছাড়া আর কিছু হবার উপায় না দেখে মা চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনেক অবাধ্য যন্ত্র স্থধীর বশ করেছে এবং অনেক অদ্ভুত কল-কব্জায় দক্ষতালাভ করেছে, কিন্তু সামান্য একটা ঝাঁটাকে বাগিয়ে ধূলোকে আয়ত্ত করা যে এত কঠিন তা তার জানা ছিল না। এক দিকে ঝাঁট দিলে আর একদিকে ধূলো উড়ে যায় এবং দুষ্টবুদ্ধি কল-কব্জাগুলো ছল করে' চারদিকে মৃত্তিকাশায়ী হতে থাকে—এ বড় বিষম জ্বালা।

যত দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়্‌ছিল স্থধীরের রাগও তত বাড়্‌ছিল ওই যত নষ্টের মূল চাকুর ওপর।

এমন সময়ে নীচে অন্নদাবাবুর গলা শোনা গেল,—"সুধীর বাড়ী আছ ?"

সুধীর নিজের অস্বস্তিকর কর্ত্তব্য থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে নীচে দরজা খুলতে গেল এবং মা নিজের ঘরে গেলেন পাগল ছেলের পরিণাম ভাবতে ভাবতে।

দরজা খুলতেই অন্নদাবাবু একগাল হেসে বল্লেন,—"চল বাবা, তোমার যন্ত্রের যাদুঘর দেখাবে। অনেকদিন থেকে আসব-আসব করে'ও হয়ে ওঠে না।"

সুধীর নিজের বিশৃঙ্খল ঘরের দুর্দ্দশা স্মরণ করে' বাইরে আনন্দ দেখালেও মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো না। অন্নদাবাবুর পেছনে অপরাধীর মতো চারুলেখা সিঁড়ি বেয়ে সুধীরের ঘরে ঢুকল।

প্রৌঢ় অন্নদাবাবুর ভেতর এমন উৎসাহী দর্শক পাবে তা সুধীর মোটেই আশা করেনি। সুধীরের নির্ম্মাণ-কৌশলের নানা নিদর্শনে অন্নদাবাবু বালকের মতো উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বালকের মতোই নানা অদ্ভুত ও হাস্যকর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে' তিনি সুধীরকে প্রফুল্ল করে' তুললেন। দেখতে দেখতে তিনি বল্লেন—"অমন কাব্য-রসিকের ছেলে এমন বিশ্বকর্ম্মা হবে তা কখন ভাবিনি। তোমার বাবা ছিলেন একেবারে ভাবের

ফানুস,বস্তু-জগতের আঁচও তাঁর গায়ে সইত না। আমাদের তখনকার গল্প শুন্‌বে? আমাদের দুজনের রেষারেষি ছিল কোথায় কে নতুন সাহিত্যিক নাম কর্‌লে তার খোঁজ আগে নিয়ে অপরকে চম্‌কে দেওয়া, এর জন্যে কি কাণ্ডই না করেছি! ইংরেজি মাসিকপত্র যা পারতুম কিনতুম, যা পারতুম না যেখানে পেতুম আগে গিয়ে পড়ে আস্‌তুম, তাও দুজন দুজনকে লুকিয়ে। তোমার বাবা হয়ত এসে বল্লে—"ওঃ, আর্‌মেনিয়ার যা একজন কবি আছে—'রাফি,' পড়েছ?"

আমিও ঠক্‌বার পাত্র নই, বল্লুম—'হাঁ 'রাফি' আবার কবি? পড়ো পড়ো 'সিঞ্জের' নাটক, পড়ো, বুঝবে কত বড় লিখিয়ে!'

তোমার বাবা বল্লেন—' 'সিঞ্জ' আবার পড়িনি, ওই আইরিশ ত!'

আমি বোকা হয়ে গেলুম। তার পরের বার হার্‌বার পালা হয়ত তোমার বাবার। এম্‌নি আমাদের চল্‌ত শুধু সাহিত্যালোচনা।"

অন্নদাবাবুর গল্প শেষ হ'তে হেসে চোখ নামাতেই চারু ও সুধীরের চোখাচোখি হয়ে গেল। সুধীর ভ্রূকুটি করে' চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এরোপ্লেনের কল-কব্জা বুঝোতে

লাগ্‌ল। অন্নদাবাবু মাঝ থেকে বল্লেন—"তা তোমার ঘরটা এমনি অগোছাল থাকে নাকি ?"

সুধীর চারুর দিকে ফিরে একটা রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে হঠাৎ অন্নদাবাবুর দিকে চেয়ে থেমে গেল, শুধু বল্লে—"না, এই আজকাল একটু হয়েছে।" আজ সুধীর প্রথম লক্ষ্য করলে শুধু এইটুকু যে, সে-দিনকার সেই একরত্তি চারু আজ সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী কিশোরী হয়ে উঠেছে, তাকে যখন-তখন যা-তা তিরস্কার করা আর সাজে না।

সকলে যখন যন্ত্রালোচনায় তন্ময় তখন উৎপল এসে ঘরের ভেতর অপরিচিত লোক দেখে দরজায় থমকে দাঁড়াল। সুধীর তখন জটিল যন্ত্রশাস্ত্র ব্যাখা করতে এবং অন্নদাবাবু তাঁর অনায়ত্ত মন নিয়ে যথাসাধ্য বোঝ্‌বার চেষ্টা করতে ব্যস্ত। শুধু চারু চোখ তুলে চেয়ে বল্লে—"আসুন উৎপল-দা, বাবা আজ অধীর-দার কারখানা দেখ্‌তে এসেছেন।"

অন্নদাবাবু ফিরে চাইলেন। উৎপল নমস্কার করে' বল্লে—"আপনার কাজে ব্যাঘাত দিলুম মিছিমিছি।"

"না না ব্যাঘাত কি ?" বলে' অন্নদাবাবু তাকে বস্‌তে বল্লেন।

সুধীর উৎপলের দিকে চেয়ে হেসে অন্নদাবাবুকে বল্লে—"এইবার কিন্তু আপনার দলের লোক পেয়েছেন, উৎপল একজন মস্ত কবি।"

অন্নদাবাবু বল্লেন—"তাই নাকি, বেশ বেশ, আপনার কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পেলে সুখী হব।"

উৎপল বল্‌তে যাচ্ছিল, "আমাকে 'আপনি'-বলা কেন?"

কিন্তু চারু বাধা দিয়ে ভয়ানক উৎসাহিত হয়ে বল্লে —"সত্যি উৎপলবাবু, আপনি কবি নাকি? কই আমায় তো জানান-নি।"

অন্নদাবাবু বল্লেন—"তোকে না জানালে কেউ বুঝি কবি হতে পারে না, পাগ্‌লি কোথাকার!"

সকলে হেসে উঠ্‌ল। চারু বল্লে—"বাঃ, আমি বুঝি তাই বল্লুম। কিন্তু উৎপলবাবু, এবার আপনাকে ছাড়ছি না, আপনার কবিতা আমায় শোনাতেই হবে।"

অন্নদাবাবু বল্লেন—"তা এ মন্দ নয়। একজন যন্ত্রের কবি, আর একজন ভাষার। যাবেন আপনি আমাদের বাড়ী, ভারী খুসী হব।"

উৎপল অন্তরের উদ্বেল আনন্দ চেপে বিনীত স্বরে বল্লে—"যাব।"

সুধীর বল্লে—"উৎপল সত্যি মস্ত বড় কবি, যদিও

আমি ওর মিষ্টিক্ কবিতা মোটেই বুঝতে পারি না। আমার কাছে সব'মিষ্ট্'অর্থাৎ কুয়াসার মতোই ধোঁয়া-ধোঁয়া লাগে!"

অন্নদাবাবু বল্লেন—"কিন্তু তোমার বাবা ছিলেন Verlaine, এ-ই, দাদূ, কবীরের মস্ত ভক্ত।"

তারপর আবার যন্ত্রালোচনা স্বরু হল। যাবার সময় অত্যন্ত খুসী হয়ে অন্নদাবাবু বল্লেন—"সত্যি বাবা, তোমার যাদুঘর দেখবার জিনিষ! আমার মেয়ের মুখে তো তোমার সুখ্যাত আর ফুরোয় না, আজ থেকে আমিও তোমার ভক্ত হলুম। বাংলায় এখন তোমার মতোই ছেলে দর্‌কার, আশীর্ব্বাদ করি, দেশের মুখোজ্জ্বল করো।"

তারপর উৎপলকে বল্লেন—"যদি সেকেলে বুড়োর সঙ্গে সাহিত্যালোচনা আপদ মনে না করেন তাহলে যাবেন কিন্তু আমার বাড়ী। চেনেন ত, ঐ সাম্‌নেই।"

অন্নদাবাবু চারুর হাত ধরে' বেরিয়ে গেলেন, নিজের আনন্দে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন চারুরই বিশেষ দরকারে তার আহ্বানেই তিনি সুধীরের বাড়ী এসেছিলেন। কি যে দরকার চারুর, তা তাঁর জান্‌বার সময় বা চারুর বল্‌বার সুযোগ কিছুই হল না।

আর এখানে বারান্দায় দুই বন্ধু এই প্রথম মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েও বিভিন্ন চিন্তার ধারা নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

সাত

দর্জ্জিহীন দর্জ্জিপাড়ার সান্যালদের সুখ্যাত বা অখ্যাত ছিল যে, তাদের মাথায় ছিট্ আছে। এই ছিটের অস্তিত্বের ওপর দর্জ্জিপাড়ার প্রভাব কেউ অবশ্য আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেনি যদিও এই নিয়ে ব্যঙ্গ-নিপুণদের কল্পনার নানা বৈচিত্র্য প্রকাশ পেত। সান্যালরা পাঁচ ভাই মিলে ছিলেন বাণীর একনিষ্ঠ সাধক। তাঁদের সকলেরই ছিল বিবাহে বিদ্বেষ। বড় ভাই ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, তার পরের ভাই চিত্র-শিল্পী, তৃতীয় ভ্রাতা ভাস্কর, চতুর্থ অভিনেতা ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিল উৎপল কবি। এম্‌নি করে' তাঁরা বীণাপাণির প্রায় সকল বিভাগেই নিজেদের প্রতিনিধি রাখ্‌বার বন্দোবস্ত করেছিলেন। এই অদ্ভুত পরিবারে এক উৎপল ছাড়া আর সকলেরই বাণীর সেবায় শক্তির চেয়ে উৎসাহ ছিল অনেক বেশী এবং সাধনা ছিল কঠোর। আপন-আপন বিভাগে তাঁরা

মাঝারি গোছের সুনাম অর্জ্জন করতে পেরেছিলেন। এ-হেন আবহাওয়ায় মানুষ এবং নিজে একজন সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও উৎপলের বন্ধুত্ব কেমন করে' সুধীরের প্রতি প্রগাঢ় হয়েছিল তা সহজ বুদ্ধিতে বোঝা শক্ত। উৎপলের সমস্ত দেহে মনে কার্য্যে সৌন্দর্য্য ও শক্তি ছিল খুবই বেশী কিন্তু তার চেয়ে বেশী ছিল ইসারা। তাই সে যত সুন্দর তার চেয়ে তাকে দেখাত ঢের বেশী সুন্দর, সে যা লিখ্‌ত তাতে আসল জিনিষের চেয়ে ইঙ্গিতই পাঠককে মুগ্ধ কর্‌ত এবং তার ব্যবহারে স্পষ্ট শোভনতার চেয়ে অস্ফুট মিষ্টতাই বেশী লোককে আকৃষ্ট কর্‌ত। উৎপল ছিল তার প্রতিভাহীন ভাইএদের গৌরবের ভাই।

সেদিন বেশী কথা বল্‌বার মতো মনের অবস্থা কারুর ছিল না, তাই কিছুক্ষণ দু-একটা অবান্তর কথা বলেই উৎপল বাড়ী চলে এল। কিন্তু ঘরের নির্জ্জন অবকাশ আজ তার ভাল লাগ্‌ছিল না, পরিপূর্ণ নদীর মতো উচ্ছল অধীর মনের মধ্যে অস্ফুট আশা যত কলরব কর্‌ছিল। সে কলরবের অর্থ বুঝতে তার নিজেরও সাহস হচ্ছিল না। তার মন চাইছিল এমন কারুর সঙ্গ, যে তার সব চেয়ে প্রিয় চিন্তা থেকেই তাকে এখন মুক্তি দিতে পারে।

দূরের ট্রাম রাস্তায় অদ্ভুত কোলাহলের সঙ্গে মিশে নিকটের কোন বাড়ীর বেসুরো হার্‌মোনিয়মের সুর ও কচি কোন্ শিক্ষানবীশের মিষ্টি গলা ভেসে আস্‌ছিল অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। দক্ষিণের নবকিশলয়-সমৃদ্ধ দেবদারুর বসন্ত বাতাসের স্পর্শে বিপুল শিহরণ সে অন্তরের মধ্যে অনুভব কর্‌ছিল। কি অপরূপ স্পন্দন জেগেছে আজ তারও অন্তরের রহস্যলোকে শুধু একটি কিশোরীর মায়া-স্পর্শে! তারের সঙ্গে আজ তার বেজে উঠ্‌ছে অকারণে অর্থহীন সুরের উন্মাদনায়। জানে সে পৃথিবীতে নির্ম্মম দুঃখ আছে, কুৎসিত দারিদ্র্য, বীভৎস রোগ, অভাবনীয় পাপ ও পঙ্কিলতা আছে, কিন্তু আজ তার চারধারে আছে শুধু একটি অপূর্ব্ব ফাল্গুনের জগৎ যেখানে আকাশের চোখে অপরূপ নেশা, জলে স্থলে অপূর্ব্ব মিলনের ষড়্‌যন্ত্র, যেখানে নতুন তৃণ ও বনের ফুল প্রাণের প্রাচুর্য্যে অস্থির হয়ে উঠেছে যেখানে বাতাসের স্পর্শে অনাদি অতীতকালের সমস্ত গোপন প্রথম প্রণয়-চুম্বনের আভাস ও ভবিষ্যতের সমস্ত চুম্বনের আশ্বাস, যেখানে নব কিশলয়ের অশ্রান্ত মর্ম্মরে চিরকালের গোপন কথার সঙ্কুচিত শিহরণ!

নিজের এই উন্মাদ আনন্দের সঙ্গে বেশীক্ষণ মুখোমুখি

হয়ে থাকতে উৎপলের ভয় করছিল, সে আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে সঙ্গী খুঁজ্‌তে গেল। কিন্তু এত সকাল-সকাল আসার দরুণ কোনো দাদাকেই ঘরে দেখ্‌তে পেলে না। এবার সে নিরুপায় হয়ে ঘরে ফিরে এসে নিজের লেখাগুলো উল্টে নিজের প্রথম প্রণয়ের রূপ দেবার চেষ্টা গুলি পড়্‌তে বসল। বেতের সুদৃশ্য বাক্সটি থেকে অজস্র লেখার ভেতর হতে বেছে নিয়ে সে 'বিরূপাক্ষ'-য় পড়্‌লে—

"কিন্তু সেই হিংস্র করাল দেশের ভ্রূকুটি-কুটিল মরু-জ্বালাময় দৃষ্টির তলায়ও একদিন লগ্নাজিতার মন নিশান্তের আকাশের মত কোন্ অপরূপ সম্ভাবনার রুদ্ধ-নিশ্বাস প্রতীক্ষায় থর-থর করে' কেঁপে উঠ্‌ল। কোন্ অসম্ভব সার্থকতার আশ্বাসে অন্ধকারের অন্তরের সে কি সুমধুর আতঙ্কের আন্দোলন, দিকে দিকে আশাতীত সৌভাগ্যের প্রত্যাশায় সে কি গোপন বিপুল আয়োজন..."

জান্‌লা দিয়ে রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে উৎপল ভাবলে সেদিনের এই প্রেমের প্রথম সঞ্চারের রূপ দেবার চেষ্টায় কথার মায়াজালের তলায় কত ফাঁকি কত ত্রুটিই না ছিল!

আবার বেছে-বেছে 'নির্ব্বোধ' বা'র করে' পড়লে—
"সমস্ত বিদ্রূপ সমস্ত ব্যঙ্গ সমস্ত লাঞ্ছনার অত্যাচার

পার হয়ে আজ এই নগণ্য নির্ব্বোধের মনে কিন্তু বসন্তের সমস্ত কচি সবুজ পাতা এক সঙ্গে কাঁপছিল এবং সমস্ত পুষ্প-জগতের সৌরভ স্তবের মত উঠছিল অসীম শূন্য ভরে। আজ যে সে জানে সুন্দরী ফাল্গুন-রাত্রির গোপন নিমন্ত্রণ-লিপিটি তার—শুধু একমাত্র তার। যে বড়-সাহেব আজ তাকে তিরস্কার করেছে, যে বড় বাবু তাকে অপমান করেছে, যারা তাকে নিয়ে পরিহাস করেছে, হতভাগ্য তারা ত জানে না যে নবকিশলয়ের পথে বিশ্বের চিরকালের মায়াবী দেবতা আজ শুধু তারি বুকের দীপটি জ্বালাতে দখিন বাতাসের রথে ভুবনের দ্বারে এসেছে—"

মনে-মনে হেসে আবার 'কাগজ-কুচি'তে পড়্লে—"তখন বাইরেও তাদের মনের ভেতরে নব বর্ষার স্নিগ্ধ শীতল মেঘের ছায়ায় আর প্রখর রৌদ্রালোকে মিলে অপূর্ব্ব মায়ালোক রচনা করেছে। প্রেমের কল্যাণ কর তখন সংসারের সমস্ত কটু কঠোর কঠিন কুশ্রিতার ওপর কমনীয়তার অপূর্ব্ব কোমল প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে। যেমন বাইরে তখন রৌদ্র ছায়ার ক্ষণিক মিলনের মায়া-জগৎ অন্তরেও তেমনি বাস্তব অবাস্তবের মিলনে অসম্ভব একটি দিনের দিল্‌দরিয়া আনন্দের রাজ্য..."

কাগজগুলো তুলে রেখে সে ভাবলে কল্পনায় প্রেমের অনেক ব্যাখ্যা সে করেছে, কিন্তু আজ সে শুধু একটি কথা ছাড়া আর কি বল্‌তে পারে? আজ সে সমস্ত উচ্ছ্বাস বাদ দিয়ে শুধু একটি কথা বলতে পারে "ভালবাসি", আর কিছু নয়।

বাইরে তার দাদা এসে ডাক্‌লে—"কি উৎপল, আজ খাওয়াটা এখানে হবে, না বন্ধুর বাড়ীতেই সেরে আসা হয়েছে?"

"না, যাচ্ছি" বলে' উৎপল আবার লেখার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনটি ভাবতে লাগ্‌ল।

তিন বৎসর আগের কথা, কলেজে সুধীরের সঙ্গে নতুন আলাপ হওয়ার পর সেই তার দ্বিতীয় বার সুধীরের বাড়ীতে যাওয়া। সুধীর তাকে ঘরে বসিয়ে রেখে খানিকক্ষণের জন্য মাকে তার কথা বলতেই নীচে গেছ্‌ল বুঝি। দর্‌জার দিকে পেছন ফিরে বসে' সে সুধীরের ঘরটি দেখছিল। এমন সময়ে পেছনে দ্রুত চঞ্চল পায়ের শব্দ শুনে সে একটি কস্তাপাড় শাড়ীর অঞ্চল ও দুটি সুন্দর সুগঠিত পা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়নি, আর শুন্‌তে পেয়েছিল মিহি মিষ্টি গলায় "আমার কিন্তু এখনি উত্তর চাই অধীরদা।" অবাক হয়ে ফিরে দেখে পায়ের কাছে

রুল্-টানা কাগজে লেখা একটি চিঠি পড়ে আছে। চিঠি কাকে লেখা এবং কার দ্বারা লেখা তার কোন হদিস্ নেই। কৌতূহল খুব বেশী হওয়ায় সে চিঠিটা পড়ে ফেল্লে। চিঠির আরম্ভ একেবারে সপ্তমে—

"তুমি ভেবেছ বুঝি তোমার সঙ্গে কথা না কইলে আমার আর দিন যাবে না। ওঃ, ভারী বয়ে গেছে আমার তোমার সঙ্গে কথা কইতে। তোমার খোট্টা যন্ত্র যেন না দেখলে আর কারুর ঘুম হয় না। আমরা দুপুর-বেলা কেমন গ্রামোফোন্ বাজাই, ছবি দেখি...চাই না তোমার ঘরে আস্তে। আমি মার কাছে মাসীমার কাছেও বলেছি যে, অধীরদাটা ভারী স্বার্থপর একগুঁয়ে, আর কখন ওর ঘরে যাব না। এই যে আসি না তোমার ঘরে আমার যেন ভারী ক্ষতি হচ্চে তাতে..."অধীরদার ঘরে না এলেও যে কারুর বিশেষ ক্ষতি হয় না সে কথাটা এমন ঘটা করে জানানর দরকারের কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে উৎপল দেখ্‌ল শেষের দিকে স্বর কিন্তু একেবারে সপ্তম থেকে খাদে নেমে অধীরদাকে সেদিনকার বিশেষ কোন আশ্চর্য্য বায়স্কোপ দেখাবার জন্যে পায়ে ধরে মিনতি করাতে এসে ঠেকেছে।

শেষকালে আছে, "সত্যি অধীর-দা আর কক্‌খনো

তোমার অবাধ্য হব না, তুমি এইবারটি শুধু ক্ষমা করো, এবার থেকে তুমি যা বল্‌বে দেখো তা যদি না করি, ত আমায় ঘরে আর ঢুকতে দিও না। তোমার পায়ে পড়ি অধীরদা; আজকে ভারী স্থন্দর ফিল্‌ম্‌ হবে, তুমি না গেলে বাবা কিছুতেই যেতে দেবে না। দোহাই অধীরদা, আর রাগ করে থেকো না, তোমার পায়ে ধরি...”

হাস্‌তে হাস্‌তে এই অপরূপ চিঠিটা উৎপল মুড়ে যথাস্থানে রাখ্‌তে যাচ্ছিল এমন সময় পেছন থেকে ঈষৎ বিস্মিত গলায় শুন্‌তে পেলে—“ওমা কাকে অধীরদা ভেবেছি।” ফিরে চাইতে চাইতেই সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওইটুকুর মধ্যেই একটি স্থন্দর মুখের দুটি দীর্ঘায়ত নয়নের বিস্ময়-মাধুর্য্য দেখবার অবসর তার যথেষ্ট হয়েছিল।

নীচে থেকে ন'দার গলা শোনা গেল—“ও উৎপল আমরা সবাই খেতে বসেছি যে।”

ভাবনার মধ্যপথে থেমে উৎপল তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে খাবার ঘরে নেমে গেল।

আট

সুধীর তার সবল হাতে মুগুরের ঘায়ে একটা বাক্সের চারিধারে পেরেক মার্‌ছিল, আর উৎপল যে-কথা বল্‌তে এসেছিল সে-কথা বল্‌বার সুযোগ এ পর্য্যন্ত না পেয়ে অকারণে বাটালিটা নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌ছিল। আজ সুধীরের কোনো কাজে তার কোনো ঔৎসুক্য না থাক্‌লেও একবার জিজ্ঞেস কর্‌লে—"কোথায় যাবে বাক্সটা ?"

"গয়ার এক লিমিটেড্ এগ্রিকাল্‌চ্যারাল কোম্পানির অনুমোদনের জন্য পাঠাচ্ছি।"

"কি আছে ?"

"সেই কলের লাঙ্গলের মডেল্‌টা।"

"তারা কিন্‌তে পারে ?"

"দেখি চেষ্টা করে', টাকার ত বিশেষ দর্‌কার আমার এখন।"

এ-সব কথায় কোনো আগ্রহ না থাকলেও উৎপল জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কত দর্‌কার ?"

"অন্ততঃ হাজার পাঁচেক না হলে ত আর নতুন কিছুতে হাত দিতে পার্‌ছি না। এই ছোট ঘরে মডেল্ তৈরী কর্‌লে ত আর চল্‌বে না, একটা কার্‌খানা ঘরের বিশেষ দর্‌কার হয়ে পড়েছে।"

উৎপল চুপ করে' রইল। সুধীর পেরেক্ ঠুক্‌তে লাগ্‌ল।

হঠাৎ উৎপল কোন ভূমিকা না করে'ই জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"আচ্ছা চারুলেখার বাবার নাম কি ?" তার পর কৈফিয়ৎ স্বরূপ বল্লে—"ভদ্রলোকের সঙ্গে কাল আলাপ হল, কিন্তু এখনো নামটা জানা হোল না।"

এই অবান্তর প্রশ্নের আকস্মিকতায় কিছুমাত্র বিস্ময় কিন্তু সুধীরের মুখে দেখা গেল না। সে অন্যমনস্ক ভাবে বাক্সের ওপর ঠিকানা লিখতে লিখ্‌তে বল্লে—"শ্রীঅন্নদা সুন্দর বসু।"

আবার উৎপল খেই খুঁজে না পেয়ে চুপ কর্‌লে। সুধীর বাক্সটায় ঠিকানা লেখা শেষ করে' সেটা একধারে সরিয়ে রেখে বল্লে—"যাক্, দেখা যাক্, এই প্রথম চেষ্টার ফল কি হয় ?"

উৎপল শুধু বল্লে—"আশা করা যাক্, ভালই হবে।"

আবার সমস্ত চুপচাপ। বাইরে রাস্তায় দমকলে জল দেবার শব্দ শোনা যাচ্ছে, বিকেল হয়ে এসেছে। টেলি-ফোনের তারের ওপর বসে' কাকের দল কোলাহল করছিল।

সুধীর ততক্ষণে আবার একটা ইলেক্‌ট্রিক্ ষ্টোভ নিয়ে বসেছে। উৎপল বল্লে—"তোর কি একদিনও বিশ্রাম করতে ইচ্ছে হয় না সুধীর? ভালো লাগে রোজ এই কল-কব্জা ঘাঁটার একঘেয়েমি?"

"তোর কবিতা গল্প লিখ্‌তে লিখ্‌তে বিরক্তি আসে?"

"তাও মাঝে-মাঝে আসে।"

"আমার কিন্তু আসে না, এখনও ত আসে নি।"

উৎপল সাহস করে' পাড়্‌লে, "একবার প্রেমে না পড়্‌লে তোর আর কল-কব্জার মোহ থেকে নিষ্কৃতি নেই।"

"তুই তা হলে' পড়েছিস্ বল প্রেমে?"

খানিকক্ষণ কোন কথা না বলে' উৎপল আবার আরম্ভ করলে—"আচ্ছা সুধীর, সত্যি কি তুই কখন কাকেও ভালোবাসিস্ নি?"

"বাস্‌ব না কেন, এই যেমন..."

"না, তা বল্‌ছি না, ও রকম নয়..."

"না, বাসিনি অন্য কোন রকম।"

উৎপল একটু থেমে বল্লে—"আচ্ছা, চারুলেখা মেয়েটি বেশ—না?"

এইবার সুধীর কাজ থেকে চোখ তুলে একটু বোধ হয় অবাক্ হয়ে বল্লে—"ভারী দুষ্টু।"

"না না, আমার ত খুব ভালো লাগে।"

"ও, দূর থেকে দেখ্‌লে অমনি ভালো লাগে, আমায় একেবারে জ্বালাতন করে মারছে।" হঠাৎ সুধীরের মনে পড়ে' গেল আজ পাঁচদিন সে ঘর গুছিয়ে দ্যায়নি এবং সেদিন ডাকতে গেলেও অবাধ্য হয়ে আদেশ শোনে নি, তারপর অন্নদাবাবুর সঙ্গে ছল করে এলেও ক্ষমা না চেয়ে পালিয়ে গেছে সুতরাং তাকে শাস্তি দেওয়া দরকার। রাগের স্বরে বল্লে—"এবার আর ঘরে ঢুকতে আসে যেন কোনোদিন!"

উৎপল একটু ব্যথিত স্বরে বল্লে—"তুই অত বড় মেয়েকে সেদিন ও রকম করে' বকে' ভালো করিস্‌নি, বিশেষতঃ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলাটা।"

সুধীর আবার অবাক্ হয়ে চোখ তুলে বল্লে—"বক্‌বো না? ঘরের কোথায় কি রাখবে ঠিক থাকবে না, জিনিষ ভেঙে ফেল্‌বে, আর তাকে মিষ্টি কথা বল্‌তে হবে?"

কিন্তু উৎপল সমস্ত জগতে চারুলেখাকে তিরস্কার কর্‌বার সপক্ষে কোন যুক্তি থাক্‌তে পারে এ কল্পনাও না কর্‌তে পেরে শুধু বল্লে—"আমার এমন কষ্ট হয়েছিল সত্যি সুধীর, লেখাকে আমার এত ভালো লাগে…"

এবার সুধীর ষ্টোভ্‌টা সরিয়ে বিস্মিত কৌতুক দৃষ্টিতে উৎপলের মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠ্‌ল। তারপর বল্লে —"ওঃ হরি, চারীকে তুই ভালোবেসেছিস্ নাকি রে?"

উৎপল লজ্জিতমুখে চোখ্‌ নামিয়ে চুপ করে' রইল। সুধীর হাসিতে সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে তুল্‌লে।

কিন্তু জড়-ধেয়ানি এই যন্ত্র-পুরোহিতের হৃদয়ের কোন গোপন তন্ত্রীতে কি উৎপলের এই অপ্রত্যাশিত স্বীকারোক্তিতে ক্ষণেকের তরেও কোন বেসুর মূর্চ্ছনা বেজে ওঠে নি? তার একান্ত অনুগত চিরকালের বাধ্য যন্ত্র-পূজায় নীরব সেবিকা চারুলেখার পক্ষে আর কারুর ভালোবাসার পাত্রী হওয়ার মতো অদ্ভুত নতুন কল্পনার মধ্যে কি তার অপরিসীম বিস্ময় ও অশেষ কৌতুক ছাড়া কোন সামান্য বেদনার তিলমাত্র আভাসও ছিল না?

সুধীরের মুখে "ডাকি তবে এইবার চারীকে" এবং উৎপলের মুখে কি একটা অস্ফুট প্রতিবাদ কিন্তু দ্বারের দিকে চেয়ে থেমে গেল।

নিজের সমস্ত অপমান ও অভিমান দমন করে' তখন চারুলেখা অপরাধীর মতো ধীরে-ধীরে এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছে। ভেতরে যেতে তার পা উঠছিল না।

হঠাৎ গত পাঁচদিনের অপরাধ ও অবাধ্যতা স্মরণ করে' সুধীর গম্ভীর মুখে ষ্টোভটার ওপর অত্যন্ত মনোযোগ প্রদান করলে। এবং উৎপল সমস্ত কান রাঙা করে' নির্ব্বাক হয়ে বসে' রইল।

সুধীরের গম্ভীর মুখে কোন ভরসা না পেয়ে চারু দরজার পাশেই দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। উৎপল না থাকলে হয়ত সে আগেকার মতই অধীরদার মান ভাঙাতে চেষ্টা করত সেধে-কেঁদে অনুনয়-বিনয় করে', কিন্তু উৎপলের উপস্থিতিতে সেটা একেবারেই সম্ভব নয়।

সুতরাং নিরুপায় হয়ে তার সদ্যজাগ্রত নারী-হৃদয়ের লজ্জার মর্য্যাদা রাখবার চেষ্টা একমাত্র অধীরদার কাছ থেকেই একান্ত মনে প্রত্যাশা করে' সে চুপ করে' রইল।

কিন্তু সুধীর ত্রিভুবনের কাউকে কোন লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি দেবার কোনরকম লক্ষণ না দেখিয়ে নীরবে অনাবশ্যক গম্ভীর মুখে ষ্টোভের স্ক্রুগুলো অকারণে খুলতে ও লাগাতে লাগল।

যত সময় যাচ্ছিল তত চারুলেখার বুকে একটা

দুর্নিবার ক্রন্দনের উৎস প্রবল হয়ে উঠ্‌ছিল, তার সঙ্গে ছিল এই অকারণ অপমানে একটা ক্ষুব্ধ ক্রোধের বিদ্রোহ।

শেষে আর থাকতে না পেরে সে অস্বাভাবিক রূঢ়স্বরে বল্লে, "তোমায় বিরক্ত কর্‌তে এসেছি ভেবো না অধীরদা, বাবা কাল উৎপলবাবুর কবিতা শুন্‌তে চেয়েছিলেন তাই দেখতে এসেছিলুম উৎপলবাবু এসেছেন কি না? উৎপলবাবু, আপনাকেই ডাক্‌তে এসেছি, যাবেন কি আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে?" চারুর ঠোঁট কাঁপছিল অবরুদ্ধ ক্রোধের প্রাবল্যে।

সুধীর ও উৎপল দু'জনেই চম্‌কে চারুর মুখের দিকে চাইল। উৎপল করুণস্বরে বল্লে—"কিন্তু আমি তো আমার লেখা আনিনি।"

চারুলেখা কঠিন হয়ে উত্তর দিলে, "না এনেছেন না এনেছেন, এখন আমার সঙ্গে আস্‌তে আপনার আপত্তি আছে কি না বলুন-না!"

উৎপল বল্লে—"না আপত্তি থাকবে কেন? তারপর ইতস্ততঃ ক'রে উঠে বল্লে—"যাচ্ছি, সুধীর তুমিও চল না।"

সুধীর শুধু বল্লে—"না।" তারপর গম্ভীর মুখে কাজ কর্‌তে লাগ্‌ল।

উৎপলকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নাম্‌তে নাম্‌তে চারুর মনে হল—কিন্তু সবই বৃথা, ওই যন্ত্রোন্মাদ হৃদয়হীন অধীরদার পাষাণ বুকে এই নিদারুণ শরও চিরকালের মতই ব্যর্থ হয়ে যাবে, একটুখানি আঘাতও দিতে পারবে না।

নয়

ওই সামান্য পথটুকু পার হ'য়ে উৎপলকে নিয়ে তাদের বাড়ী যাবার মধ্যেই কিন্তু চারুর মনে অনেক প্রশ্নই উঠেছিল এবং সদ্য সদ্য যে আকস্মিক ঘটনাটি ঘটে গেল তাতে তার নিজের অংশটুকুর শোভনতা ও সঙ্গতি সম্বন্ধে অনেক সন্দেহই জেগে উঠ্‌ল। যখন সে নিজের সমস্ত অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে অধীরদার সঙ্গে মিট্‌মাট্‌ কর্‌তে গিয়েছিল তখন সে কল্পনাও করতে পারেনি, ভাগ্যের কারসাজিতে সে একটু পরেই এতখানি আঘাত পেয়ে তার কণামাত্রও ফিরিয়ে দিতে না পেরে অমন করে' সেখান থেকে চলে আসবে উৎপলকে নিয়ে। নিজের লজ্জা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তখন উৎপলকে ডাকার ওজর দেখালেও এখন উৎপলকে যে কেমন করে বাড়ীতে নিয়ে যাবে ভেবে পাচ্ছিল না।

বাড়ীতে অন্নদাবাবু অবশ্যই এখন হঠাৎ কাব্যরস উপভোগ কর্‌বার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। এরকম অবস্থায় অকারণে উৎপলকে তাদের বাড়ীতে টেনে নিয়ে গিয়ে বিব্রত করা যে কতদূর অশিষ্টতার পরিচয় এবং তাতে উৎপলের তার সম্বন্ধে ধারণা কি-রকম হওয়া সম্ভব, তা কল্পনা করে' সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ কর্‌ছিল। আর উৎপলের সাম্‌নেই অমন করে' মেজাজ দেখানো ও অধীরদাকে উপেক্ষা করে তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় টেনে আনা যে যে-কোন লোকের চোখেই বিসদৃশ ঠেক্‌তে পারে এটা বোঝা বিশেষ কঠিন নয়। শুধু চল্‌তে আরম্ভ করলে আর থামা যায় না বলেই চারুলেখা উৎপলকে নিয়ে তাদের বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসাতে পার্‌লে, নয়ত সম্ভব সে পথের মাঝেই থেমে উৎপলকে বল্‌ত, 'আমায় ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে অকারণে ডেকে এনে অপমান করেছি।' অন্ততঃ তা হলে সে ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যের ভাবনা থেকে মুক্তি পেত।

উৎপল এই অসময়ে এই অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণের আকস্মিকতায় একেবারে যে বিস্মিত হয়নি এমন নয়, কিন্তু যত কথা সে ভাবছে মনে কোরে চারুলেখা অস্থির হয়ে উঠ্‌ছিল তার কিছুই ভাবে নি। ভাব্‌বার মতো

অবস্থা তার ছিল না, সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। একটা বিলিতি শোফায় নরম গদিতে বসে পড়ে' সে নিজেকে নিতান্ত বেখাপ্পা মনে করে' অন্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল।

চারুও এই একান্ত অস্বস্তিকর সমস্যা সমাধান করবার কোন উপায় না পেয়ে ঘরের মাঝের শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপরকার ফুলদানীগুলি নিয়ে অনাবশ্যক নাড়াচাড়া করছিল। খানিকবাদে সে উৎপলের মুখের দিকে না চেয়েই বল্লে—"বসুন, আমি বাবাকে ডেকে আনি—" তারপর পেছনের দরজা দিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণ যে-ভাবনার স্রোত উৎপলের মনে চারুর উপস্থিতিতে রুদ্ধ হয়েছিল এই একলা হওয়ার সুযোগে তা হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠ্‌ল! উৎপলের মনে হোল যে-সৌভাগ্যের জন্যে সে এতদিন একান্তমনে কামনা করে' এসেছে সেই সৌভাগ্যই তার এল এ কি বিকৃত বেশে! এতক্ষণ সে অন্ততঃ এইটুকু বুঝতে পেরেছিল যে সুধীরের ঘরে যাবার কারণ চারুলেখার আর যাই থাক্ না, তাকে নিমন্ত্রণ করে' আনা কোনমতেই সে কারণ নয়। তবু তাকে এমন করে ডাক্‌বার তাৎপর্য্যও সে ভালো করে' বুঝতে পারছিল না।

তা বুঝতে পারলে ভবিষ্যতের অনেক জটিলতা হয়ত সেইদিনই সহজ হয়ে যেত।

অন্নদাবাবু উৎপলের আগমনের জন্যে প্রস্তুত না থাকলেও তাঁকে কোন রকমে বুঝিয়ে আনা বিশেষ কঠিন হবে না ভেবেই চারুলেখা তার বাবার খোঁজ করতে গেছল, কিন্তু সেদিন যেন সকল দিকেই ভাগ্য তাকে প্রতিহত করে' পরিহাস করতে বদ্ধ-পরিকর হয়েছিল। চারু ওপরে গিয়ে জানলে অন্নদাবাবু কোনো বিশেষ কাজে তাঁর সাধারণ অভ্যাসের ব্যতিক্রম করে' বেরিয়ে গেছেন।

নিরুপায় হয়ে অতিথির সম্মান রাখতে চারুলেখা আবার বাইরের ঘরে ঢুকল, কিন্তু এবার তার গতিতে বিমূঢ়তার শৈথিল্য ছিল না, সে কোন একটা বিষয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে এসেছিল।

চারুলেখা উৎপলের দিকে চেয়ে বল্লে—"বাবা ত ঘরে নেই, বেরিয়ে গেছেন!" তারপর উৎপলকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই এক নিশ্বাসে বলে' গেল—"আমায় ক্ষমা করুন উৎপল-দা, আমি বাবাকে না জিজ্ঞেস করে'ই আপনাকে ডেকে এনেছি। আপনাকে ডেকে আনতে আমি যাইনি ওখানে, কিন্তু

আপনি যদি তখন না আস্‌তেন তা হলে' আমার লজ্জা রাখবার আর জায়গা থাকৃত না। আমাকে লজ্জা থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনাকে শত ধন্যবাদ উৎপল-দা।"

চারু চুপ কর্‌লেও তার এই কৈফিয়ৎ ও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে বিচলিত হয়ে উৎপল কোন কথা বল্‌তে পার্‌লে না।

চারু আবার বল্লে, "আপনি খুব প্রতিভাবান মহা-পুরুষ না হতে পারেন উৎপলদা, কিন্তু এইটুকুর জন্যে আপনাকে আমি চিরকাল শ্রদ্ধা কর্‌ব যে আপনি মানুষ, কাউকে অকারণে বারবার অযথা পীড়ন করে' আপনি নিষ্ঠুরের মতো আনন্দ উপভোগ করেন না।" বলতে বলতে চারুর গলা ভারী হয়ে উঠ্‌ল।

উৎপল এইবার বিস্মিত করুণ দৃষ্টি চারুর মুখে তুলে বল্লে, "এত কথা তুমি আমায় বল্‌ছ কেন লেখা? তোমায় কোন্ লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছি তা আমি জানি না, কিন্তু যদি কোনো লজ্জা থেকে পরিত্রাণ দেবার উপকরণ হয়ে থাকি তবে তাতে আমারই গৌরব মনে কর্‌ছি, তোমার কৃতজ্ঞতার কোনো কারণ নেই।"

চারুলেখার অন্তরের নব-জাগ্রত মহিমান্বিত নারী এই

অযাচিত শ্রদ্ধার অঞ্জলিতে প্রীত না হয়ে থাকতে পারল না। সে স্মিত মুখে নীরব হয়ে রইল।

এমন সুন্দর চোখে উৎপল কোনো নারীকে কোনো-দিন দেখেনি। এই কিশোরীর স্বগৌর প্রতিভামণ্ডিত মুখে, আষাঢ়ের মেঘের মতো ঘনকৃষ্ণ ভুরুর তলায়, পূর্ণিমা শর্ব্বরীর মতো রহস্যভরা দুই চোখে কৈশোরের তরলতা ও যৌবনের নিবিড়তা একসঙ্গে মিশে ছিল। অন্তরে যে প্রেম নিয়ে পুরুষ সমস্ত নিখিলের সৌন্দর্য্য ও বিস্ময়-মণ্ডিত করে' নারীকে নারীর চেয়ে অনেক বড় করে' দেখে, উৎপলের চোখে ছিল সেই দুর্লভ প্রেমের দৃষ্টি। তাই তার যৌবনের নিভৃত নিলয়ের দীপটিতে যে প্রথম ও সম্ভবতঃ শেষ আলো জ্বালাল তাকে এমন করে' একান্তে পাওয়ার মাধুর্য্যে তার কাছে কল্‌কেতার ধূলি-ভারাক্রান্ত চিরমলিন বিষণ্ণ সন্ধ্যাও পরম রমণীয় হয়ে উঠ্‌ল।

অনেকক্ষণ দুজনেই কোনো কথা কয়নি। উৎপলের মুগ্ধ দৃষ্টির মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিস্তব্ধতার ভার হাল্কা করবার জন্যে চারুলেখা হেসে বল্লে—"বা, আমরা ত খুব কাব্যালোচনা করছি।"

উৎপল লজ্জিত হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টি সরিয়ে বল্লে—"কাব্য না

থাক্‌লে কাব্যালোচনা কি করে হতে পারে তা ত আমি বুঝি না।"

"বা, তা বুঝি হতে পারে না?"

"পারে। কিন্তু আমি সে-রকম অবাস্তব আলোচনার পক্ষপাতী নই।"

চারু উঠে বল্লে, "তা হ'লে কাব্যালোচনা ত হল না, এমন দেখি, কোনো বাস্তব রসালোচনার জোগাড় কর্‌তে পারি কিনা!"

উৎপল বাধা দিয়ে বল্লে—"না না, একে আমার ও বিষয়ে বিশেষ দুর্নাম আছে, তোমাদের বাড়ীতেও সেটা আর প্রচার কর্‌তে চাই না।"

"দুর্নামকে চাপা দিলেই ত আর দুর্নাম চাপা পড়ে না, আর নিছক সুনামের লোভ বেশী ভালো নয়।" বলে চারুলেখা ভেতরে চলে গেল। উৎপলের মনে হ'ল সুধীরের বাড়ীতে সময়ে অসময়ে যে লেখাকে সে দেখেছে এ যেন তার আর এক রূপ! এখানকার লেখার মধ্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠ পরিণত-মন নারীর বিকাশ অনেক বেশী স্পষ্ট।

খাওয়া শেষ হ'লে লেখা বল্লে, "কাল বিকেলে আস্‌বেন উৎপলদা, আমি বাবাকে বলে' রাখ্‌ব কিন্তু।"

উৎপল বল্লে, "আচ্ছা"

তখন পথে গ্যাস্ জ্বেলে দিয়ে গেছে এবং নির্ম্মম নিরপেক্ষ দিনের আলোয় ব্যস্ত কুশ্রী কল্‌কাতা রাত্রির অস্পষ্টতায় তার অসংখ্য জীবনের গোপন কাহিনীর বৈচিত্র্য নিয়ে অদ্ভুত অপরূপ হয়ে উঠেছে!

উৎপল রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল। একবার শুধু সে ফিরে তাকালে, তার মনের কোণে একটি গোপন ক্ষীণ আশা ছিল যে লেখা দরজায় এখনো আছে।

কিন্তু অন্ধকারের দরুণ বা যে কারণেই হোক্ সেখানে কাউকে দেখা গেল না।

দশ

কলকব্জায় জাঁতা বিশৃঙ্খল ঘরটার এক কোনে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে' সুধীর নোংরা হাতে একটা সাইড্-কার-বিহীন অথচ দু'জন-বসা' একটা নূতন ধরণের মোটর বাইকের মডেল্ গড়্ছিল। ধূলোয় আবর্জ্জনায় ঘরটা একদম্ শ্রীহীন্ হয়ে রয়েছে, উদাস নির্ব্বিকার এই জড়-পূজারীর চোখেও সে-কুশ্রিতা এড়াচ্ছিল না। সুধীর যতই তার কাজে মন দেবার চেষ্টা কর্ছিল ততই তার মন দুলে উঠ্ছিল বারে বারে, সে এই অকারণ চাঞ্চল্যের কোনো সংজ্ঞা দিতে পার্ছিল না। সেদিন অস্বাভাবিক অসুলভ কর্কশস্বরে তাকে অযথা তিরস্কার করে উৎপলকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে চারুর স্বভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনকে সে মোটেই আয়ত্ত কর্তে পার্ছিল না। এও হতে পারে? চারুর গলার স্বরে যে এতটা রুক্ষ

বিষ ঝরে' পড়তে পারে, সুধীরের কোনো কালে তা জানা ছিল না। তা ছাড়া একদিন কি ছাই একটু বকেছে, তার জন্যে এমন করে একেবারেই কি আর আস্‌তে হয় না? তার বকুনি খেয়ে চারী রাগ করে' তার ঘরের দরজা পর্য্যন্ত মাড়াচ্ছে না, এর মতো আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার সুধীর যেন কোনো দিন আর ছাখেনি, এমন কি তার অত্যদ্ভুত অপ্রত্যাশিত নূতন-নূতন আবিষ্কারের মধ্যেও।

সুধীর তার যন্ত্রের থেকে মুখ তুলে বল্লে,—"কি রে, তোর কাজ হোল নন্দ?"

"না, এই হচ্চে।"

সেদিন দোরের গোড়া পর্য্যন্ত এসে তার ঘরে না ঢুকে চারু বাইরে দাঁড়িয়েই তাকে রুক্ষ স্বরে তিরস্কার করে' উৎপলকে নিয়ে চলে' গেলে পর সুধীর রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল একটা ছোক্‌রা মিস্ত্রির খোঁজে। সে বল্লে—"ভারী তো আমার ঘর-গুছোনিরে, ও ভেবেচে ওকে না হলে আমার যেন আর চলে না, ভারী দেমাক হয়েচে ওর।"...তুদিন ঘুরোঘুরির পর মোটরের একটা কার্‌খানা থেকে সে বেশী মাইনে দিয়ে এই ষোলো-সতেরো বছরের ছেলেটীকে তার নতুন কাজে ভর্ত্তি করে' নিয়েছে, কাজের মধ্যে

তো তুই, শুধু ঘরটা গুছিয়ে রাখা, আর চাইবামাত্র হাতের কাছে এটা ওটা সেটা এগিয়ে দেওয়া। কিন্তু এই যন্ত্রোন্মাদ তপস্বীটি বুঝ্‌তে পার্‌ছিল এ দুটি কাজ সুসঙ্গত ভাবে নির্ব্বাহিত হলেও যেন প্রকাণ্ড ফাঁকা রয়ে যাবে যা শত নন্দতেও ভরাট্ হয়ে উঠ্‌বে না।

নন্দটার কালো কুৎসিত মুখের দিকে চেয়ে সুধীরের ভারী রাগ হচ্ছিল। তাকে এই ছোঁড়াটা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তার যন্ত্রধ্যানে অভিনিবেশ দেবার অব্যাহতি দিচ্ছে না। "এটা কোথায় রাখ্‌ব, বাবু?" "এটা দিয়ে কি হবে?" এম্‌নি অজস্র প্রশ্ন করে' সে তাকে ব্যতিব্যস্ত ও অস্বাভাবিক ভাবে রাগান্বিত করে' তুল্‌ছিল। সে অস্ফুট ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বল্লে—"এই সব আনাড়িদের কর্ম্ম যন্ত্র গুছোনো, পার্‌বে খালি বিঁড়ি টান্‌তে। অকর্ম্মণ্য কুড়ের দল।" তার নোংরা তেল্‌চিটে কাপড়, পান-খাওয়া কালো দুটো ঠোঁট্, ঘাম-ঝরা আদুল গা তার সমস্ত যন্ত্র-নিকেতনটি যেন কুশ্রী বীভৎস করে' তুল্‌ছিল তার চোখে। কল-কব্জার সমস্ত আয়োজনের মধ্যে কি যেন একটি অম্লান সৌন্দর্য্য বাস কর্‌ছিল এতদিন, আজ যেন তা হারিয়ে গেছে।

নন্দ দু'হাতে কতকগুলি বইর গাদা নিয়ে ভীত কণ্ঠে

বল্লে, "এগুলি কোথায় রাখ্‌ব বাবু ?" সুধীর রুক্ষ গলায় বল্লে—"চুলোয়।"

নন্দ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তার মনিবের পানে চেয়ে রইল মূঢ় দৃষ্টিতে। সুধীর চোখ নীচু করে' সাইকেলের ষ্টিয়ারিঙ্‌ হুইলটায় বৃথা মনোযোগ দিচ্ছিল।...সহসা চোখ্‌ তুলে সুধীর রুখে উঠে দাঁড়িয়ে তীব্রকণ্ঠে বল্লে—"গেল আমার এরোপ্লেনের পাখাটা ভেঙে! পাজী শুয়ার, বইগুলি মেঝেয় রাখ্‌তে হয়! সেল্‌ফ দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না?" বলে ধাঁ করে' নন্দর গালে এক বিপুল চড় বসিয়ে দিলে। নন্দর হাত থেকে সমস্তগুলি বই সশব্দে যন্ত্রপাতির ওপর লুটিয়ে পড়্‌ল। সুধীর রাগে অন্ধ হয়ে নন্দর কান ধরে'এক ঝাঁকানি দিয়ে বল্লে—"বেরো ব্যাটা আজিই আমার ঘর থেকে, মেঝের ওপর বই গুছোচ্ছেন!"

নীচের থেকে গোলমাল শুনে মা তাড়াতাড়ি উঠে এসে সন্ত্রস্ত হয়ে শুধোলেন—"কি হোল রে সুধীর?"

সুধীর চড়া গলায় বল্লে—"হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! সবাই মিলে আমার পেছনে লেগেছে। আন্‌লাম একটা ব্যাটাকে ধরে' ঘর গুছোতে, দিলে আমার এরোপ্লেনের পাখা ভেঙে। যত সব আনাড়ী অকেজো কর্ম্মনাশারা।"

মা নন্দ বেচারীর কান্না-ম্লান মুখখানা দেখে ব্যথা অনুভব করে' বল্লেন—"তা বলে' তুই ওকে মার্‌বি ?"

"না দুধকলা খাওয়াব। তোমার আর বিরক্ত কর্‌তে আস্‌তে হবে না। আমি চল্লুম, যাক্ সব ভেঙে, বয়ে' গেল !" বলে' সিঁড়ি দিয়ে নেমে চল্‌ল।

মা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন—"কোথায় যাচ্চিস্ রে এই রোদে ?"

নাম্‌তে নাম্‌তে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সুধীর জবাব দিলে—"চুলোয়।"

তপ্ত রৌদ্রে যন্ত্রোন্মত্ত রাজধানীর বিপুল বীভৎস রূপ দেখে সুধীরের মনে আবার যন্ত্রের নেশা লাগ্‌ল। ট্রামের চলাচল, মোটরের হুঙ্কার, অসংখ্য যন্ত্রের বিপুল প্রাণের স্পন্দন, সহস্র চিম্‌নীর উত্তুঙ্গ শিখরে যন্ত্র-দেবতার ধূম-নর্ত্তন, সবাই মিলে সুধীরের মনে অভিনন্দন পাঠালে। সে খানিকক্ষণ মন্ত্র-মুগ্ধের মতন ঘুরে বেলা হলে বাড়ী পৌঁছে ডাক দিলে—"মা !"

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লেন—"কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ ? ঘামে যে একেবারে ভিজে গেছিস্।"

সুধীর মাকে দুই বাহুতে আলিঙ্গন করে' বল্লে—

"একটু রৌদ্রে ঘুরে এলাম মা। এত কষ্টের এরোপ্লেনের মডেলটা দিলে ভেঙে! কি করতে ইচ্ছে করে বল ত?"

মা বল্লেন—" তা না হয় সারিয়ে নিতে পারতিস্। কিন্তু ছেলেটা যে কাঁদতে-কাঁদতে চলে' গেল..."

আলিঙ্গন ছেড়ে হঠাৎ সুধীর আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"চলে গেল?"

"তা যাবে না? ও-রকম ভাবে মারলে কেউ বুঝি থাকে?"

"তুমি রাখতে পারলে না? বল্লে না কেন অন্যায় করেছিস্ তাই মেরেছে। বল্লে না কেন, বাবুর মাথার ঠিক নেই..."

"বল্লাম তো, কিন্তু কে শোনে আমার কথা? ছোঁড়াটা কেঁদে কেঁদে বল্লে, এমন মা'র কোনদিন আর খায়নি।"

এবার সুধীর রুখে উঠল,বিরক্তি-ভরা কটু কণ্ঠে জোরে বল্লে—"ভারী নবাব হয়েছে সব, ভারী দেমাক! একটু বকেছি কি মেরেছি, তার জন্য একেবারে রেগে কেঁদে ঘর থেকে চলে' যাওয়া! দ্যাখা যাবে সব! আমার ভারী চাকরের অভাব হবে কি না কল্‌কাতায়। বেটা

পাজী নচ্ছার হতভাগা!" বলে ছম্ ছম্ করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

সেদিনকার দু'পহরে করবার মতো তেমন কোনো কাজ তার হাতে ছিল না। টেবিলটার সামনে বসে' সে Gibson এর Hydro Electric Engineering পড়ছিল, কিন্তু কিছুতেই মন বস্‌ছিল না তাতে। নন্দ-ছোঁড়াটা চলে' গেল, তার যন্ত্র-জগৎ আবার সেই অসীম শূন্যতায় ভরে' উঠেছে। যতই সে সমস্ত ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পড়ায় দ্বিগুণ মনোযোগ দিতে যাবে ততই বারে-বারে তার মনে পড়ছিল উৎপলের সেই অদ্ভুত ভারী গলার কথাগুলি। সেদিন ঠাট্টা করে' কথাগুলিকে উড়িয়ে দিলেও. আজ তারা কোথাকার একটুখানি রং মেখে তার মনে মোহ সঞ্চার কর্‌ছিল। চারুকে অন্য কারুর ভালো-লাগার মধ্যে কি যেন একটা ষড়যন্ত্র আছে যা নির্ব্বিবাদে সহ্য করে' যাবার মতো ঔদাসীন্য এবং ক্ষমা করে' যাবার মতো উদারতা সুধীর পাচ্ছিল না আজ খুঁজে। এই অলস দু'পহরের স্নিগ্ধ অবকাশটি তাকে ভারী অস্থির করে' তুলেছে। তারপর মনে হচ্ছিল চারুর সঙ্গে উৎপলের সেই বেরিয়ে যাওয়াটা। উৎপলের সমস্ত আচরণের মধ্যে অনধিকার প্রবেশের মতো কি যেন একটা

ভীষণ অপরাধ রয়েছে, কিন্তু সেই অপরাধের শাস্তি দেবার মতো যোগ্যতা তার কৈ? সে সমস্ত ভাবনা মন থেকে তাড়াবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হোল। "দূর্ ছাই" বলে' হাতের মোটা বইটা মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একবার হাই তুলে গা ভেঙ্গে চাঙ্গা হয়ে যন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তে সুরু কর্‌লে।

এমন সময় মা "চারু এখানে এসেচে সুধীর?" বলে' সেখানে এসে হাজির হলেন।

সুধীর বিস্মিত হয়ে বল্লে—"না, এখানে আস্‌বে কেন?"

"বাঃ, নীচে এসেছিল মেয়েটা একথালা খাবার নিয়ে, কে একজন জমিদার অন্নদাবাবুকে ভেট্ পাঠিয়েছেন, থালাটা সাম্‌নে রেখেই কোথায় যে চলে গেল' দেখ্‌লাম না, ভাব্‌লাম তোর ঘরে বুঝি আছে।"

"আমার ঘরে তাকে আস্‌তে দিলে ত? আসুক দেখি না সে একবার!"...

মা চলে' গেলে সুধীরের মনে চারুর সেই কথাটা তোলপাড় করে' উঠ্‌তে লাগ্‌ল, চারু তাদের বাড়ী আসে, অথচ তার ঘরে ঢোকে না। সে মুখে যতই কেন না বলুক, সে তাকে এ-ঘরে আস্‌তে দেবে না, কিন্তু এতে মন

কি তার সত্যিই সায় দিচ্ছিল ? যদি তেম্‌নি ঘাস-রঙের শাড়ীটি পরে' ছোট-ছোট ঠোঁট্ ছুটি রাঙা ডালিমের রসে ভিজিয়ে নিয়ে এই একলা দু'পহরে তার দরজার চৌকাট-টার পারে দাঁড়িয়ে ডাকে—অধীরদা ! তবে কি সত্যিই সে তাকে তাড়িয়ে দিতে পারে আর ?

সুধীর ভাব্‌লে—'না, এরকম ভাবে পারা যায় না।' সমস্ত যন্ত্র যেন বিকট দৈত্যের মতো হাঁ করে' তাকে গ্রাস কর্‌তে উদ্যত হয়েছে, কর্ম্মহীন এতবড় অবকাশটা সে সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিল না। সে ভাবলে, শাসিয়ে অনুনয় করে' মিষ্টি কথা বলে' নূতন যন্ত্র দেখাবার লোভ দেখিয়ে সে চারুকে নিয়েই আস্‌বে ঘরে আজ। এই কথাটি মনে গ্রহণ করতেই তার সমস্ত অস্বস্তি দূর হয়ে গেল, সহজে যে এমন মীমাংসায় উপনীত হতে পারা যায় তা তার ধারণা ছিল না। তার আর দেরী সইছিল না, ভাব্‌ছিল—এখুনি গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে আসে !

এগারো

বৈশাখের সন্ধ্যাকাশ অকারণে সেদিন রুখে ছিল। তার আর সব দাদারা বজ্রের হুম্‌কি, বিদ্যুতের ঝিকিমিকি ও আসন্ন ঝঞ্ঝায় ভীত বিহ্বল আকাশের মূর্ত্তি দেখে ঘরে গা ঢাকা দিয়ে কেউ বেহালা সাধ্‌ছিলেন, কেউ চীনাবাদাম চিবুচ্ছিলেন, আর দুটিতে মিলে থ্যাবা-বিস্তি ও পেটাপেটি খেল্‌ছিলেন! উৎপল আস্তে-আস্তে তার কবিতার খাতাটি চাদরের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে বর্ষা-প্রতীক্ষা-মগ্ন তপ্ত ধরণীর ধূলি-পথে বেরিয়ে পড়্‌ল। এই মেঘ-মোহাচ্ছন্ন অবনমিত আকাশ কার সেই দুটি যুগল আঁখির প্রতিবিম্ব তুলে ধরেছে। আজ আবার সেই দুটি চোখে নবসৌন্দর্য্যের ছন্দ শুন্‌তে সে অভিলাষী, আজ তার খালি ইচ্ছা হচ্চিল তার কবিতার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় সেই দুটি ছন্দভরা নয়নে সে গতির সঞ্চার করে দ্যায়।

বাইরের ঘরে বসে' অন্নদাবাবু তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে গুড়গুড়ি টান্‌ছিলেন ও তাঁর পায়ের তলায় বসে' চারুলেখা তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, এমন সময় উৎপল সেখানে হাজির হোলো। চারু উৎফুল্ল হয়ে বলে' উঠ্‌ল—"উৎপলদা এসেছেন বাবা। এতক্ষণ আপনার জন্ম অপেক্ষা কর্‌ছিলুম, ভাবছিলুম, আস্‌বেন না বুঝি। মেঘ দেখে হয়ত পদ্য উথলে উঠ্‌ল। তা, এনেছেন তো খাতাটা? না, আবার ভুলে গেছেন?"

অন্নদাবাবু বল্লেন—"বসো বাবা বসো। দেখো, কি সুন্দর মেঘ করে এসেছে, একটা বৃষ্টির কবিতা পড়।"

উৎপল অল্প একটু হেসে তার গরদের চাদরের তলা হতে জাপনী-ধাঁচের বাঁধানো খাতাটি বা'র করে' পড়তে লাগ্‌ল নূতন অদ্ভুত ছন্দভঙ্গীতে—

"আজ সারা সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টির আয়োজন চলেছে আকাশে। দুর্য্যোগের রাতে কোন্ সে বিরহিনী নারী অভিসারিকা হয়ে কার সন্ধানে বেরুল, কোন্ দূরে কোন্ গ্রহ-তারকার নিদ্রাহীন নিশীথিনীতে কে তার দয়িত পরম রমণীয় বিরহব্রত উদ্‌যাপন কর্‌ছে! কণ্টকাকীর্ণ তিমিরাচ্ছন্ন বিপদ-সঙ্কুল এ পথ, তবু ঘর-ছাড়া পথহারা এ কোন্

পথ-বাসিনী তরুণী যাত্রা করল আজ ঝটিকার হাহাকারে বিদ্যুতের অগ্নিশিখায় বৃষ্টির রোদন-মহোল্লাসে! আকাশ-পথের সমস্ত তারার প্রদীপ ম্লান, বর্ষার অক্লান্ত ক্রন্দনধারায় পথের সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে, কূল নেই দিশা নেই থই নেই, তবুও এ বিরহিণী চলে কোথায় কার উদ্দেশে? ক্লান্ত অথচ বিরামবিহীন তার চলা, যুগে যুগে তার এই অভাবনীয় অনির্ব্বচনীয়ের উদ্দেশে এই অভিসার, কিন্তু কোথায়, তার বিরহী ভগবান কোথায়?"

'চমৎকার, চমৎকার' ব'লে অন্নদাবাবু লাফিয়ে উঠলেন, পরে উৎপলের হাত দুটো ধরে' খুব জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠ্‌লেন "এতদিনে একজন খাঁটি কবির সন্ধান পেলুম। তুমি যে এত ভালো লিখতে পার এ আইডিয়া আমার একেবারে ছিল না।" উৎপলের বুক আত্মপ্রসাদে ভরে গেল।

আর সেই নবকিশলয়ের মতো কিশোরীটি ভোর-বেলাকার সূর্য্যমুখীর মতো একান্ত শ্রদ্ধা ও কমনীয় আনন্দে বিভোর হয়ে উৎপলের আবেগদীপ্ত মুখের পানে চেয়ে রয়েছিল। সে উৎপলের সমস্ত কথার মানে বুঝতে পারে-নি, কিন্তু তার কবিতার সেই মন্দাক্রান্তা বিরহ-ব্যথা জাগিয়ে-তোলা অপরূপ তন্দ্রাচ্ছন্ন সুরটি, কি-যেন

বল্‌তে চাইবার ইসারাটি—তার বুকে ভারী দোলা দিতে লাগ্‌ল, ভাষাহীন কি নবীন ছন্দোময় স্তোত্র উঠেছে তার মনে! চারুলেখা মুগ্ধ হয়ে দেখতে পেলে উৎপলের লম্বা কোঁকড়ানো চুলে, স্বপ্নভরা স্নিগ্ধ দু'টি চোখের তারায় ভোরের আলোর শিখার মতো সরু সূচলো আঙুলগুলিতে তার আবৃত্তিভঙ্গী ও স্বরের মূর্চ্ছনায় কি এক মাদকতার শিখা কাঁপছে। চারুর বুক নববর্ষার মেঘের মতো থর্‌থর্ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।

একলা অন্নদাবাবুর প্রশংসাতেই উৎপলের মন খুশী হয়ে উঠতে পার্‌লে না, তাই চারুর পানে চেয়ে সে শুধোলে—"তোমার কেমন লাগ্‌ল?"

চারু কি করে' যে তার ভাবের ভাষা দেবে বুঝতে পাচ্ছিল না। খানিকক্ষণ থতমত খেয়ে চোখে শ্রদ্ধা নিয়ে সে বল্লে—"ভারী ভালো লেগেছে আমার। সমস্তগুলি কবিতা না-শুনিয়ে কিছুতেই আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি না আজ। কি বল বাবা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ পড়ো গোটাকতক—পড়িয়ে শোনাও উৎপল! ভারী চমৎকার তোমার ছন্দ, ভারী সুন্দর তোমার ভাব-ব্যঞ্জনা।"......

কালবৈশাখীর আক্ষেপ তখন থেমে গেছে আকাশে!

হঠাৎ কথার মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে বইটা হাতে তুলে উৎপল বল্লে—"এবার যাই।"

চারু ধরা গলায় বল্লে—"এত তাড়াতাড়ি যাবেন?"

চারু একটু ভেবে দেখ্‌লেই সহজেই বুঝ্‌তে পার্‌ত, বেশী তাড়াতাড়ি মোটেই নয়, উৎপল প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে' এসে বসে' আছে, কিন্তু আজ তার আর সময়ের মোটেই ঠিক ছিল না। উৎপল যেন একটা পুঞ্জীভূত কবিতার উন্মাদনা হয়ে তাকে আকর্ষণ করছিল, অতি আচম্‌কা এই তরুণ কবির অপূর্ব্ব ছন্দে তার বুকে তৃষিত প্রকাশ-প্রয়াসিনী নারীটি যেন জেগে উঠেছে!

তবু উৎপল সত্যিই দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে চারু করুণ কণ্ঠে বল্লে—"খাতাটা আমাকে দিয়ে যান-না।" অন্নদাবাবু চেঁচিয়ে বল্লেন—"দিয়ে যাও খাতাটা উৎপল, সব কবিতা তো শোনা হোল না, আমি একটিবার দেখ্‌ব, চারুও দেখ্‌বে।"

উৎপল জীবনে তার কবিতার খাতা কোনোদিন হাতছাড়া করেনি, কিন্তু আজ সে আর কোনো দ্বিরুক্তি কর্‌লে না, স্বচ্ছন্দচিত্তে চারুর হাতে তা সঁপে দিলে। চারু দোরের গোড়া পর্য্যন্ত এগিয়ে এল, দুই চোখ্‌ পূরে তার বিদায়ের ব্যথা গোধুলি-আকাশের মতো ধুসর হয়ে উঠ্‌ল।

উৎপল আর একবার চারুর মুখের ওপর চোখের দৃষ্টিটি ছুঁইয়ে পথে নেমে পড়ল।

পথে নেমেই সে চম্‌কে দাঁড়াল, খানিকটা আগে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সুধীর। এই রাত্রে তার যন্ত্রের ধ্যান ছেড়ে সুধীর এখানে? উৎপল এগিয়ে এসে আনন্দভরা কণ্ঠে বল্লে—"এই সুধীর যে, কোথায় যাচ্ছিস্, লেখাদের বাড়ী?"

সুধীর চারুকে শুনিয়ে তীব্র কণ্ঠে বল্লে—"বয়ে গেছে আমার ও অলক্ষ্মীটার বাড়ী যেতে। আমার কতগুলো স্ক্রু ও পেরেকের বিশেষ দরকার পড়েছে, কিন্‌তে যাচ্ছি।" সুধীর জান্‌ত এ পথ দিয়ে বাজার যাওয়া যায় না, তাই সে আর বৃথা কথা না কয়ে' উল্টো পথে বেরিয়ে গেল।...

চারুলেখা উৎপলের কবিতার খাতাটা দুই হাতের মুঠির মধ্যে চেপে ধরে' হতবাক্ হয়ে ঘুমন্ত পথের পানে চেয়ে রইল।

বারো

এগারোটা বেজে গেছে ঘড়িতে, চারুলেখা পালঙের ওপর আল্‌গোছে চুপটি করে' শুয়ে ছিল একান্ত শিথিল আলস্য ভরে। তার দিনগুলি যেন আর কাটে না! সকাল হয়, দুপুর আসে, রাত্রির কোলে তপ্ত দিন আবার ঢলে' পড়ে, চারুর খালি মনে হয় যেন দিনের পায়ে কে লোহার বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে। এর আগে অবকাশের এই দুঃসহ শ্রান্তি তাকে যেন পীড়া দ্যায়নি। কোনো কাজই যেন তার হাতে নেই, তার জীবন যেন দেউলে হয়ে গেছে এ ক'টি দিনে!

অধীরদা সেদিন বাড়ীর এত সাম্‌নে এসে তাকে দর্‌জার সামনে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখেও এলেন না, এ কথা ভাব্‌তে গেলে চারুলেখার সমস্ত বুক ঠেলে এক কান্না রুদ্ধ অভিমানে গুম্‌রে ওঠে। তার অলক্ষিতে আজ মহীয়সী নারীটি জেগেছে তার বুকে, তাই আর-

আর বারের মতন সেধে যেচে অধীরদার স্নেহ ও ক্ষমা ভিক্ষা করে' ভাব কর্‌বার মতো হীনতাকে সে কিছুতেই পোষণ কর্‌তে পার্‌ছিল না। তার খালি এই কথাই মনে পড়্‌ছিল বারে বারে—তার অবমানিত অভিমানাহত বিক্ষত নারী হৃদয়ের অভিমানের মর্য্যাদা রাখবার জন্যে অধীরদা নিজে এসে তার ক্ষমা চেয়ে আদর করে' ডেকে নিয়ে যাবে; কিন্তু সেই জড়-ধেয়ানি যন্ত্র তান্ত্রিক নিষ্ঠুর সাধকের বুকে একটুখানি করুণা জাগাবার মতো ক্ষমতা যেন তার নেই, কোনো বাণই যেন সেই নিরপেক্ষ নির্ব্বিকারচিত্ত পূজারীর অটল বর্ম্ম ভেদ করতে পার্‌বে না।

চিত্রলেখা ঘরে ঢুকে বল্লে, "নাইতে যাবি না নাকি চারি ?"

"এই যে যাচ্চি।" বলে' চারু যেম্‌নি শুয়ে ছিল, তেম্‌নি উদাস মুখে শুয়ে রইল।

চিত্রলেখা বল্লে—"কি বিশ্রী আওয়াজ হচ্চে, লোহার ঝন্‌ঝন্, হাতুড়ীর চীৎকার..."

"যেন বুকে এসে লাগে!" বলে' চারু নিজের গলার স্বর শুনে মনে মনে একটু চম্‌কালে!

"কি করে' যে ভালো লাগে ওর রাতদিন এই সব বাজে খেয়াল ?"

"তুমি একে বাজে খেয়াল বল্‌ছ দিদি? একদিন যদি দেখতে যাও ওঁর যাদুঘর, তবে দেখতে পাবে কি রকম সব অদ্ভুত আবিষ্কার তিনি করেছেন, একেবারে অবাক্ হয়ে যাবে। সমস্ত মন ঢেলে দিয়েছেন ঐ কাজে, যেমন পরিশ্রমী, তেম্‌নি..."

চিত্রলেখা হেসে বল্লে, "তেম্‌নি গোঁয়াড়-গোবিন্দ। মার মুখে শুন্‌লুম ওর কোন চাকরকে এক চড় মেরেই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে।"

"এত কষ্ট করে' একটা এরোপ্লেনের মডেল গড়েছেন, তার পাখাটা আনাড়ী ছোঁড়াটা ভেঙে ফেল্‌লে, এতে কার না রাগ হয়? তোমার ওই চমৎকার সেলাইটা যদি আমি জলন্ত আগুনে বেশ করে' ধরাই, তবে তুমি আদর করে' আমার গালটা টিপে দাও, না?"

দিদি হেসে বল্লে, "গালটা টিপে দিই বটে, কিন্তু হয়ত তাতে রক্ত বেরিয়ে পড়বে তোর।"

চারু হেসে উঠে বল্লে, "তেম্‌নি অধীরদাও ছেলে-টার গালে একটু হাত বুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তবে আদরের মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে পড়তেই বেচারার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়েছে।"

দুজনেই হাস্‌তে লাগ্‌ল।

চিত্রলেখা বল্লে—"নে ওঠ, মা ডাক্‌ছেন। কান ঝালাপালা হয়ে গেল লোহার আওয়াজে।" বলে' সে চলে' গেল।

রান্নাঘরে দুটি বোন একসঙ্গে বসে' খাচ্ছিল, সাম্‌নে বসে' অন্নদাবাবু খাচ্চিলেন আর পরিবেশন কর্‌ছিলেন সুনয়নীদেবী। ব্রাহ্ম জমিদার গৃহিণী হলেও সুনয়নী দেবী এ পর্য্যন্ত নিজের বিশেষ অসুস্থতা ছাড়া রোজই স্বামীর পাক করে' দিয়েছেন, রাঁধুনে বামুনের হাতে এই ভোজন-বিলাসী জমিদারটির আহার মোটেই রুচ্‌ত না। খেতে খেতে নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্চিল বাপ ও মেয়েদের মধ্যে।

অন্নদাবাবু চিত্রলেখাকে বল্লেন—"তুই যদি আর দুদিন আগে আস্‌তিস্ ছবি, তবে উৎপলের মুখে তার নিজের লেখা কবিতা শুন্‌তে পেতিস্, ভারী চমৎকার সে! আমি এতদিনে একজন রসিক তরুণ কবির সন্ধান পেলুম।"

চিত্রলেখা জিজ্ঞেস কর্‌লে—"কে উৎপল?"

"সুধীরের বন্ধু, ভারী নম্র অমায়িক ছেলেটি, তার কবিতায় কি উন্মাদনা—কি তেজ! একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। যেম্‌নি ভাববিন্যাস, তেম্‌নি শব্দ-ঝঙ্কার।

আমার এই মর্চ্চে-ধরা মনের তারে সে নবজীবনের সুর লাগিয়ে গেছে। তুই কি বলিস্ চারু ?"

চারু বল্লে—"কি সুন্দর তাঁর সেই 'ধূর্জ্জটি' কবিতাটি, বাবা! যেন প্রতি শব্দে অধীরদার লোহার হাতুড়ীর মতো গম্ভীর ধ্বনি উঠছে!"

অন্নদাবাবু মাছের মুড়াটা মুখে তুল্‌ছিলেন, নামিয়ে রেখে বল্লেন—"হ্যাঁ, ধ্বংস দেবতা রুদ্র প্রলয়লীলায় মেতেছেন বটে কিন্তু তাঁর সমস্ত ভাঙার মধ্যে সুকোমল একটি বেদনা, সুগোপন একটি করুণা নিরন্তর উথলে উঠছে! নটবর প্রলয়েশ্বর ধ্বংসের ধূমকেতু ছেড়ে ছার্‌খার্‌ করে' দিচ্চেন বটে সৃষ্টি, কিন্তু সেই ধ্বংস-ধন্য পথে নব জীবনের বীজ বপন করে' যাচ্চেন, ঠিক অনেকটা শেলীর West Wind এর মতো, কিন্তু কি passionate!"

চারু বল্লে—"আমার মনে কি হয় জান? মনে হয় উৎপল-দা অধীরদাকে দেখেই এ কবিতার প্লট পেয়েছেন।"

"হ্যাঁ, বেশ দুটি বন্ধু জুটেছে যা হোক্। একজন যন্ত্রের পূজারী, আর একজন ভাবের উপাসক। এক-জনের কাছে জাহাজের মাস্তুল, কার্‌খানার ধোঁয়া, সহরের হৈ-চৈ, আর একজনের কাছে রাত্রির ধ্যান

নীহারিকার জীবন-চাঞ্চল্য, আকাশের অসীমতা! চমৎকার বন্ধু দুটি!"

চারু হেসে আর একটি উপমা দেবার লোভ সম্বরণ কর্‌তে পার্‌লে না, বল্লে—"একজন দুনিয়ার সমস্ত সৌন্দর্য্যে ডুবে আছেন, আর একজন ভোলা শিবের মতোই সন্ন্যাসী...নিষ্ঠুর।" শেষের কথাটা আর স্পষ্ট হয়ে ফুট্‌ল না, তার ঠোঁট্‌ দুটির আড়ালে একটু কেঁপে আব্‌ছা হয়ে মিলিয়ে গেল।

স্নয়নী দেবী এসে বল্লেন—"খেতে-খেতে আর অত কবিত্ব কর্‌তে হবে না। যাবে যখন মাছের কাঁটা গলায় আট্‌কে, কি ভাতের গরস্‌ বুকে ঠেকে তখনই সমস্ত কবিত্ব বেরিয়ে যাবে।"

চিত্রলেখা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—"তখন আস্‌বেন কৃতজ্ঞ বন্ধুরা আমাদের রক্ষা করে' তাঁদের প্রশংসার ঋণ শুধ্‌তে। সুধীর আস্‌বেন তাঁর তুরপুণ বাটালী নিয়ে গলা চেঁচে কাঁটা বার কর্‌তে, আর উৎপল আস্‌বেন ওঁর খাতা কলম নিয়ে আমাদের বিবর্ণ বিকৃত চেহারা দেখে কতগুলি কবিতা লিখে ফেলে আমাদের ধন্য কর্‌তে।"

সবাই হো-হো করে' হেসে উঠ্‌লেন।

আঁচাতে-আঁচাতে অন্নদাবাবু বল্লেন, "উৎপল তার

খাতাটি রেখে গেছে, সেটি নিয়ে আয় মা ছবি আমার বাইরের ঘরে, শোনাই তোকে।” পরে খড়্কে দিয়ে দাঁত খুঁচতে-খুঁচতে বল্লেন—“আমি কি আর তার মতো পড়তে পার্‌ব? সে কি সুন্দর পড়া!”

ওপরে এসে চিত্রলেখা চারুকে বল্লে—“কৈ দেখি উৎপলের খাতা?”

টেবিলের ওপর খাতাখানি ছিল, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চারু বল্লে—“ঐ যে, কি সুন্দর তাঁর হাতের লেখা গুলি! অধীরদার হাতের লেখা তুমি দেখেছ দিদি? মনে হয় মাকড়সার পায়ে কে কালী মাখিয়ে কাগজের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।”

চিত্রলেখা খাতার পাতাগুলো উল্টোতে উল্টোতে বল্লে —“চল্‌,যাবি না? বাবা পড়বেন।”

“না, আমি ত শুনেইছি সব, তুমি শোন গে, আমার ভারী ঘুম পাচ্চে।”

“ঘুম পাচ্চে, সে কি রে? তুই দিনে ঘুমোস্ নাকি? এ বদ্ অভ্যাস আবার কবে থেকে হোল?”

চারু বিব্রত হয়ে বল্লে—“না, এম্‌নি শুয়ে শুয়ে একটু মাসিকপত্র পড়ব, তুমি যাও, আমার আর এখন পদ্য শুন্‌তে ইচ্ছা হচ্চে না।”

চিত্রলেখা তাকে আর বিরক্ত না করে' খাতাটা নিয়ে নীচে বৈঠকখানায় নেমে গেল।

চারু কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। দিদিকে সে বল্লে বটে, তার ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু ঘুম কি আসবে তার চোখে? কাল তার দিদি এসেছেন, তার সঙ্গে কথায়-বার্ত্তার এ দিন অনায়াসে কেটে যেতে পারে, তবুও তার ভালো লাগ্‌ছে না কেন? অন্নদাবাবু উৎপলের কবিতা শোন্‌বার জন্য ডাকলেন, কবিতা সে কত ভালোবাসে, কবিতা শুন্‌লে তার মন অজানা রঙের কৌতুকে অপরূপ হয়ে ওঠে, অনায়াসে সে এই অলস মধ্যাহ্ন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু না, তার ভালো লাগেনা এ-সব! তার কোনো দিন এমন অবসাদে এমন ক্লান্তিতে কাটেনি আর!

সে পালঙে খানিক এ-পাশ ও-পাশ কর্‌লে, একটা বই কয়েকপাতা পড়ে' ভালো লাগল না বলে' ফেলে দিলে, সেলাইটা নিয়ে বস্‌ল, এস্রাজটা বাজাতে চাইল, কিছুতেই মন বস্‌ছিল না। সে বিমূঢ়ের মতন খানিকক্ষণ পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে দোতলার বারান্দার সাম্‌নে এসে হাজির হোল।

এ কয়দিন চারু ভুলেও একটিবার বারান্দায়

আসেনি, পাছে জান্‌লা দিয়ে স্থধীরের সঙ্গে একটুখানি চেখোচোথি হয়ে গেলে অধীরদা ভাবে—চারীটা লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দ্যাখে বা তার ঘরে আসবার জন্য চোখে কাকুতি পূরে তাকায়। গভীর অভিমান এতদিন তার বুকে আঠার মতো জমাট বেঁধেছিল, তাই সে বারান্দা আর মাড়ায়নি। তার আত্মপ্রতিষ্ঠ নারীত্বের অহঙ্কারকে ক্ষুণ্ণ করবার মতো দীনতাকে সে জোর করে' তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ তার পা তার চিন্তা ও সঙ্কল্পের অলক্ষিতে তাকে এই বারান্দায় টেনে আন্‌লে। চারু স্থধীরের ঘরের পানে একটি বার চোখ না ফেলে আর পারলে না।

তাকিয়েই মুহূর্ত্ত মধ্যে পলক পড়তে-না-পড়তেই চারুর দৃষ্টি প্রতিহিত হয়ে ফিরে এল। অধীরদার ঘরের জান্‌লা বন্ধ! চারুর চোখের কাছে সমস্ত বিশ্বসংসার যেন নিমেষের মধ্যে মসীবরণ হয়ে গেল। অধীরদার ঘরের অবরুদ্ধ জান্‌লাটা যেন তারই নিষ্ঠুর লৌহ-কঠিন মমতাহীন হৃদয়ের রূপক হয়ে তাকে শাসাচ্ছে। জান্‌লাটা যেন বল্‌ছে তোমার সমস্ত প্রবেশদ্বার বন্ধ হয়ে গেল, এখান দিয়ে তোমার দৃষ্টি কনিকাটীকেও পাঠাতে পারবে না আর। চারুর বুকে কান্নার সমুদ্র উথল হয়ে উঠ্‌ল। অধীরদা তাকে এমন নির্ম্মম নির্ব্বিচারে ঠেলে ফেলে পর

করে দিচ্চে ? সে আর মনে কোনো অহঙ্কার কোনো প্রতিজ্ঞার লেশ দেখতে পাচ্চিল না। তার ইচ্ছা হচ্চিল এক্ষুণি ছুটে গিয়ে অধীরদার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলে, —'আমাকে তুমি ক্ষমা কর!'

চারু আর এক মুহূর্ত্তও দেরী কর্‌ল না। বরাবর নীচে এসে চল্‌ল পথের মুখে।

চিত্রলেখা বল্লে—"কোথায় যাচ্চিস্ রে?"

"মাসীমাদের বাড়ী।"

"দাঁড়া, আমিও যাব।"

তখন চারু রাস্তায় নেমে পড়েছে, দিদির জন্য সে আর দাঁড়াল না। একেবারে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে' ডাক্‌লে—"মাসীমা!" পাশের ঘর থেকে সুধীরের মা বেরিয়ে আস্‌তে-আস্‌তে বল্লেন—"কে, চারু? আয় মা আয়, আর তো তেমন ঘন ঘন আসিস্ নে। একি ভারী রোগা হয়ে গেছিস্ যে!"

চারু ফিকা হেসে বল্লে—"কৈ রোগা হচ্চি?"

"বাঃ, চোখের কোণে কালী পড়েছে, গলার হাড় উঁকি মার্‌ছে, কৈ রোগা হচ্ছিস্? তা যাক্, শুন্‌লাম নাকি ছবি এসেছে।"

"হ্যাঁ, কাল এসেছে।"

"নিয়ে এলি না কেন তাকে ?"

"আস্‌বে 'খন।"...বলে' চারু তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল, তার বুকে ব্যাকুল কান্না বিপুল দুর্নিবার আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ছে, সে আজ সমস্ত অধীরদার পায়ের কাছে নিবেদন করে' আস্‌বে। সে ঘরের কাছে এসে দেখ্‌তে পেলে ঘরের দুয়ারে শক্ত লোহার তালা আঁটা। তার উৎকণ্ঠিত বুকে যেন লোহার হাতুড়ীর মতোই একটা ভীষণ আঘাত লাগ্‌ল। এ কি অদ্ভুত আচরণ! আজ তাকে এমন ভাবে বিপর্য্যস্ত বিক্ষত কর্‌বার জন্যেই কি অধীরদা এই নির্ম্মমতার আয়োজন করেছেন? সে অশ্রু-বাষ্প-ভরা কণ্ঠে ডাক্‌লে—"মাসী মা!"

"কি মা?"

"অধীরদা কোথায়?"

"সে খিদিরপুরে না কোথায় একটা প্রকাণ্ড কার্‌খানা খুল্‌ছে, সেখানে।"

"কার্‌খানা খুল্‌ছে, সে কি?"

"কেন, তোকে কিছু বলেনি? এ দু'দিন ধরে ত কার্‌খানা নিয়েই মেতে আছে, খাওয়া-দাওয়া নেই, রৌদ্রে টো-টো করে' ঘুরে বেড়ানো সাইকেলে মোটরে, কখন্ যে অসুখ হয়ে বসে, আমার সেই ভাবনা। সমস্ত যন্ত্রপাতি

সরিয়ে ফেলেছে প্রায়, একলা একলা কি পরিশ্রম করছে যে ছেলেটা, তেমন একটা দোসরও নেই সঙ্গে। কি যে হবে এ সব যন্তর-ফন্তরে ভগবানই জানেন।"

চারুর মুখ দিয়ে আর কোনো কথা সরছিল না। সে তার প্রথম যৌবনের প্রথম নিদারুণ ব্যর্থতা বুকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। পালঙের ওপর শুয়ে পড়ে' সে নিজের রুদ্ধ অভিমানের বেগকে কিছুতেই রোধ করতে পারছিল না, তার যৌবন-স্বপ্ন-ভরা কালো ডাগর দুই চোখে প্রথম যৌবনের জ্বালাময় অতৃপ্তিভরা প্রথম কান্নার বিপুল বাদল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল!

নীচে তখন গরদের পাঞ্জাবী-পরা উৎপল বৈঠকখানায় ঢুকে চিত্রলেখাকে দেখে একটু সন্ত্রস্ত হয়েই ফিরে যাচ্ছিল, অন্নদাবাবু গুড়গুড়ির নলটা মুখের থেকে ফেলে দিয়ে আনন্দাপ্লুত কণ্ঠে বলে' উঠলেন—"এসো বাবা উৎপল। ছবি, ইনিই আমাদের উৎপল কবি। তোমারই কাব্য-আলোচনা করছিলাম আমরা। বসো এই চেয়ারটায়।"

তেরো

যে পথ দিয়ে কোনো কাজের লোক বাজারে যায় না সেই পথেই মেঘ-নমিত আকাশের সমস্ত ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে' সুধীর লক্ষ্যবিহীন হয়ে চল্‌ল যেদিকে উৎপল গিয়েছে তার উল্টোদিকে। আজ তার জীবনে এ কি অসম্ভব সংঘটনের দিন এল হঠাৎ! তার একটানা জীবনে এমন অসঙ্গতির অত্যাচার ত কোনোদিন ছিল না। কেন সে যে চারুকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেও দর্‌জায় উৎপলকে দেখে অমন উল্টো কথা বলে' ফিরে এল, এবং কেন সে যে হঠাৎ অমন একটা মিথ্যা ওজর তুলে বস্‌ল, তার কারণ মনের মধ্যে ভাল করে' খুঁজে না পেলেও যে অস্ফুট বেদনাটি তার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে' রেখেছিল সেটিকে সে বেশ অনুভব কর্‌তে পার্‌ছিল। এই বেদনার উৎস কোন্ অন্তর্গূঢ় মর্ম্মের গোপন অতলে লুকিয়ে আছে তা কথায় বুঝাতে না পার্‌লেও তার মনে হচ্ছিল আজ চারু যেন কোন্ অকথিত অঙ্গীকার

ভেঙ্গে অক্ষমনীয় কোন্ অপরাধ করেছে, যে-অপরাধের তুলনা নেই! এরি সঙ্গে তার মনে হচ্চিল সে যেন আজ ভয়ানক অপমানিত, অত্যন্ত অপদস্থ হয়েচে চারু ও উৎপলের কাছে, তার গোপন অভিসন্ধি ও মিথ্যা ওজর ধরা পড়ে সে যেন অতিশয় ছোট হয়ে গেছে আজ।

"কি সুধীর মস্ত লোক হলে কি আর রাস্তায় চোখ চেয়ে চল্‌তে হয় না?"

চিন্তায় বাধা পেয়ে সে সাম্‌নের গ্যাসের আলোয় দেখলে তার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একজন সহপাঠী দাঁড়িয়ে। সহপাঠী আবার বল্লে—"চিন্‌তে পার্‌বে কি?"

সুধীর এবার সজাগ হয়ে লজ্জিত হয়ে বল্লে—"অন্ধকারে দেখতে পাইনি ভাই।"

"অন্ধকার যদি থাকে ত তোমার মনে, এখানে ত দেখচি খাসা গ্যাসের আলো। আচ্ছা সে কথা থাক, কিন্তু এ পথে কোথায় যাচ্ছিলে ভাই?"

সুধীর এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিল যে অন্যমনস্কভাবে সে যেখানে এসেছে সেখানে কোনো প্রয়োজনেও তার আস্‌বার দর্‌কার ছিল না, এবার কিন্তু মিথ্যা না বলে' সে বল্লে—"একটা কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে এসে পড়েছি ভাই।"

"এই না হলে বড় বৈজ্ঞানিক! কিন্তু কি নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রব্লেম্ ভাবছিলে ভাই? Industrial India-য় Paper Machinery সম্বন্ধে যা লিখেছে তা পড়ে ত আমরা সবাই অবাক যদিও কলেজেই জান্তাম, তুমি একদিন একটা মস্ত লোক হবেই।"

সুধীর এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে বল্লে—"চল ফিরি, তুমি কোন্‌দিকে যাবে।"

"তোমার পথেই যাচ্চি, চল না। সেই পাস্ করে' বেরুবার পর ত আর দেখা হয় নি। এই একবছরে তুমি কত বড় একটা লোক হয়ে উঠ্‌লে আর আমি কর্‌পোরেশনে সামান্য রাজমিস্ত্রী হয়ে আছি।"

"কি এত বড় লোক হয়েছি ভাই?"

সহপাঠী এবার অবাক্ হয়ে বল্লে—"কি হয়েছ? আমেরিকার 'Paper and Pulp" কাগজখানা তোমার প্রবন্ধ-সমালোচনায় কি লিখেছে দেখেছ? কিছু করবার ক্ষমতা না থাকলেও খোঁজ-খবরটা এখনো রাখি। পড়োনি তুমি?"

সুধীর বল্লে—"পড়েছি।"

"তবে?"

সুধীর কোন কথা না বলে' চল্‌তে লাগল। সহপাঠী

নানা কথা বল্‌তে বল্‌তে চলেছিল, হঠাৎ অন্য কথার মাঝে সে জিজ্ঞাসা কল্লে—"সুধীর, তুমি বিয়ে করেছ ?"

সুধীর একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"কেন ? না।"

সহপাঠী উল্লসিত হয়ে বল্লে—"করো নি ত ! ঠিক করেছ ভাই, কখ্‌খনো বিয়ে করো না। যার জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে তার বিয়ে করার মতো ঝকমারি আর নেই !"

সহপাঠীর এই অহৈতুক বিবাহ-বিদ্বেষে একটু বিস্মিত হয়ে সুধীর বল্লে—"কেন, বিয়ে করলে কি আর বড় হওয়া যায় না ?"

সহপাঠী উত্তেজিত হয়ে বল্লে—"কক্‌খনো না কক্‌খনো না, ছেলে মেয়ে বউ সংসার সকলের পেটের ধান্দায় বিব্রত হয়ে থাকলে কি আর অন্য কিছুর সময় থাকে ? এই আমি..."বল্‌তে গিয়ে আবার থেমে বল্লে—"তোমার বিয়ে কর্‌বার ইচ্ছে টিচ্ছে আছে নাকি ?"

সুধীরের এ পর্য্যন্ত সেরূপ কোনো ইচ্ছা না হওয়ার স্বীকারোক্তিতে আশ্বস্ত হয়ে সে বল্লে—"তা হলে আর কোরো না ভাই, আমি তোমার চেয়ে অন্য বিষয়ে অনেক ছোট, কিন্তু আমার এ উপদেশটি মেনো ভাই। শাস্ত্রের কথা একটুও মিথ্যে নয় জেনো, মেয়েমানুষ সব রকম

তপস্যারই বাধা তা জ্ঞানই হোক আর ধর্ম্মই হোক আর ইঞ্জিনিয়ারিংই হোক। এই আমি···" বলে' আবার থেমে গিয়ে বল্লে—"তোমার কাছে আমরা অনেক আশা করি, নিজেদের দিয়ে ত আর কিছু হবে না।"

তার শেষকালের কথায় এমন একটা করুণ সুর ছিল যে সুধীর তার মুখের দিকে না চেয়ে পার্‌লে না। কলেজে সে কোনোকালে ভাল ছেলে ছিল না কিন্তু অত পরিশ্রম বোধ হয় আর কেউ কর্‌ত না। এই গাধার মতো রাতদিন খাটবার জন্যে সে কত উপহাসাস্পদই না হয়েছে, কিন্তু তার জেদ্ একটুও কমেনি। তবু তার পরীক্ষার ফল কোনোকালে ভালো হ'ত না। আজ সেই প্রতিভাহীন সহপাঠীর হাড় বেরুনো জ্যোতিহীন মুখের যেটুকু সে গ্যাসের আলোয় দেখতে পেলে তাতে তার নিজের ব্যথা একটু ভুলে গিয়ে সে ব্যথিত হয়ে বল্লে দরদের সুরে—"কেন হবে না ভাই ?"

"না না সে হবে না, সে কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু তুমি আমার কথাটা রেখো। আচ্ছা চল্লুম ভাই, এই পথে আমায় একটু যেতে হবে, তোমাদের সঙ্গে দেখা হলেও মনে একটু আনন্দ হয়, আমি ত..."বলে থেমে "আচ্ছা ভাই, ভুলো না আসি" বলে সে চলে' গেল।

সুধীর তার নিজের প্রচ্ছন্ন ব্যথার সঙ্গে আর একটি বেদনার ছায়া নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে দেখলে টেলিগ্রাম এসেছে—"অনুমোদিত, আমাদের কল্‌কাতার প্রতিনিধির সঙ্গে কাল সকালেই দর-দস্তুর ঠিক করুন।" এ তার সেই গয়ায় পাঠানো মোটার লাঙ্গলের অনুমোদন।

তার পরের কয়েক দিনে সুধীরের নিশ্বাস নেবার অবকাশও ছিল না। ভাগ্য যখন নির্ম্মম হয় তখন তার নির্ম্মমতা মানুষের কল্পনার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যায়, আবার তেম্‌নি যখন সে দেয় তখন সে মানুষের অসম্ভব আশাকেও পরস্ত করে' অপর্য্যাপ্ত দানের প্লাবণে অস্থির করে' তোলে। আজ সেই উচ্ছৃঙ্খল দেবতার তার প্রতি এই অকস্মাৎ অজস্র কৃপা-বৃষ্টির ভেতর কোনো দুরভিসন্ধি ছিল কিনা, কে বল্‌বে, কিন্তু এই আকস্মিক অনুগ্রহের প্লাবনে সুধীর যে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল এটা নিশ্চিত।

দশহাজার টাকায় সুধীরের কলের লাঙ্গলের স্বত্ব বিক্রী হবার দুদিন পরেই Indian Engineering লিখ্‌লে সুধীরের ফটোসমেত—"We here introduce to our readers Mr. S. K. Sen inventor of the new motor plough. This invention makes

a new epoch in the history of Agricultural industry in India. We hardly ever thought that it was reserved for an Indian to solve the vital problem of agricultural machinery in India to devise a plough suitable to the Indian soil which even Mr. Ford will find hard, if not impossible, to out-do in simplicity and cheapness. We understand that the enterprising Trivedi Co. of Goya made a very cheap burgain...Mr. Sen is young and India can justifiably expect greater things from this young man of great promise···অর্থাৎ তেইশ বছরের ছেলের এই উদ্ভাবনী শক্তিতে সবাই বিস্মিত হয়ে গেছেন। তার পরের দিনই কল্‌কাতার এক বিখ্যাত দান-বীর ব্যবসাদার সুধীরের সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে পঁচিশ হাজার টাকা তার অনুসন্ধানের কাজ চালাবার জন্যে সাহায্য করতে চাইলেন। সুধীর অনেক ভেবে ও মার সঙ্গে পরামর্শ করে' ধন্যবাদের সঙ্গে সে-দান প্রত্যাখ্যান করলে।

তারপর নিজের যন্ত্রাগার স্থাপনের জায়গা অনুসন্ধান

কর্‌তে ও সমস্ত বন্দোবস্ত কর্‌তে সুধীরের খাবার ঘুমোবারও সময় জুটত না। তার জীবনের স্বপ্ন আজ সফল হতে চলেছে। সে সত্যই ছিল অন্তরে শিল্পী, কিন্তু তার শিল্পের ব্যঞ্জনা ছিল চক্রের সাথে চক্রের মিলনের ছন্দে, ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের অপরূপ যোজনায়, জড়ের সাথে অন্ধশক্তির মিলন সঙ্গীতে, অন্ধ জড়শক্তিকে সচেতন সেবক কর্‌বার প্রয়াসে। শক্তি-অর্জ্জনের যে বিপুল প্রেরণায় আদিম অণু-জীবাণু সীমাহীন উদ্বর্ত্তনের পথে ঝাঁকে ঝাঁকে জয়-পতাকা উড়িয়ে আজ্‌কের এই বিশ্ব-বিস্ময় মানবে এসে দাঁড়িয়েছে সেই প্রেরণাই ছিল সুধীরের মাঝে উদ্দাম। আজ সভ্য মানুষ রূপকথাতে যে আলাউদ্দিনের দীপ-দৈত্য অনুচরের কল্পনা করে'ও আনন্দ পেত, সেই বিরাট আজ্ঞাবাহী লৌহ-দানব ছিল সুধীরের স্বপ্ন ও সাধনা। এম্‌নি সব সুধীরদের দুরন্ত জিগীষার ফলেই মানুষ আজ ত্রিভুবনে দুর্জ্জয়, দুরাশা-দাম্ভিক, দুর্লভ জীব।

কিন্তু তিন চারদিনের অত্যন্ত পরিশ্রমের ফলে কতকটা বন্দোবস্ত করে' সে যেদিন ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিতে ঘরে ফিরে এল সেদিন তার মনে হ'ল অকস্মাৎ, যেন সবই বৃথা, এই সমস্ত উন্নত কর্ম্মের ঘূর্ণিপাকে ঘুরে

মরা, এই সমস্ত বিপুল আয়োজন ও অশেষ আন্দোলন সমস্তই নিরর্থক। সমস্ত বিশ্বজয় কর্‌লেও যেন মানুষের প্রাণের সব ক্ষুধা মিটে না। সে ঘরের বিছানায় শুয়ে শুয়ে অন্তরের এই অকারণ অস্বস্তির উৎস নিরূপণ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিল, মা এসে তাকে একটু বাতাস কর্‌তে বসলেন। বাধা দিয়ে সে বল্লে, "না মা, তোমার আর বাতাস কর্‌তে হবে না।"

মা পাখা না নামিয়েই বল্লেন, "এমন করে' কাজ কর্‌লে যে শরীর থাক্‌বে না।"

সুধীর উঠে পাখাটা মার হাত থেকে নিয়ে বল্লে, "তা বলে' তোমায় এই খাটুনীর পর বাতাস করতে দেব না আমি।"

মা হেসে বল্লেন, "বেশ ত বাবা, একটি বউ আন্, তাহলে আমার ত ভাব্‌তে হয় না।"

"আচ্ছা আচ্ছা, তুমি শোও গে যাও।" বলে' সুধীর পাশ ফিরে শু'ল। সত্যিই যন্ত্রের তপস্যার মাঝে কোনো-দিন নারীকে মা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে দেখ্‌বার কথা তার মনেও হয়নি। আসলে সে বিবাহ সম্বন্ধে নিজের অনুরাগ বা বিরাগ কি আছে, সে বিচার করবারই সময় পায়নি। কিন্তু সেদিনকার সেই সহপাঠীর উপদেশ

আজ এই সূত্রে মনে পড়ে' যাওয়াতে সে একবার নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে পারলে না। সেখানে যন্ত্রলোকের অসীম জটিলতা ও আতিথেয়তাহীনতার মাঝে কি ভীরু প্রণয়দেবতার মুকুল-সুরভি নিমন্ত্রণ-লিপিটি এসে কোনোদিন পৌঁছোয়নি ?

আজ সিদ্ধির সমস্ত উল্লাসও যেন বুকের কোন্ কোণের সামান্য একটু শূন্যতা তার কিছুতেই পূর্ণ করতে পারছিল না।

চোদ্দ

চারুর সব চেয়ে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল নিজেকে। কেন সে ভিখারীর মতো নিজেকে অপমানিত করতে গেল। অধীরদার এই নীরব উপেক্ষা কি সব চেয়ে বড় অপমান নয়? যে চাকরটাকে সেদিন অধীরদা কাজের ক্ষতি করবার জন্য মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে তার চেয়ে বেশী মূল্য কি চারুর আছে অধীরদার কাছে? এই চাকরটার মতোই চারু শুধু তার কাছে যন্ত্র-পূজায় আবশ্যকীয় পরিচারিকা মাত্র নয় কি? তারও সামান্য ত্রুটির জন্যে তাকে অমন করে' ভৎ‍র্সনা করার ও তার পরে তার আসা-যাওয়া সম্বন্ধে এই নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যের এই একমাত্র ব্যাখ্যা ছাড়া আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে? সমস্ত ছেলেবেলার স্মৃতি খুঁজে-খুঁজে চারু আজ দেখছিল সেই ত চিরকাল অধীরদার মন দাসীর মতো জুগিয়ে এসেছে, তার নিজের দোষ থাকুক বা

না-থাকুক ঝগড়া করে' সেই অধীরদার ক্ষমা ভিক্ষা করতে গিয়েছে চিরকাল, অধীরদা কোনদিন তার প্রতি এতটুকু মনোযোগ দিয়ে তাকে সম্মানিত করে নি। তার যন্ত্র-জগতে সেবিকারূপে ছাড়া চারুলেখার তিলমাত্র স্থান ছিল কি? আর সেই অধীরদার মনস্তুষ্টির জন্যে সে কোন্ হীনতা না স্বীকার করেছে। আজও যখন অধীরদা তার নিজের কাজে তার অস্তিত্বও বোধ হয় ভুলে গেছে সে তখন কাঙালের মতো গেছ্‌ল তার ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌তে; তার সদ্যজাগ্রত আত্মসম্মান জ্ঞানে আজ বিষম আঘাত সে অনুভব করতে লাগ্‌ল!

সুনয়নী দেবী ঘরে ঢুকে বল্লেন—"অবেলায় শুয়ে যে, চ' দেখি, বেলফুলের বাড়ী যাই একটু।"

চট্ করে অশ্রু-চিহ্নিত মুখটা মার দিক থেকে ফিরিয়ে চারুলেখা বল্লে—"আমার মাথা ধরেছে, তুমি আর কাউকে নিয়ে যাও মা।"

সুনয়নী দেবী বল্লেন—মাথা ধরেছে? জর হোল নাকি দেখি, কদিন থেকেই মুখটা শুক্‌নো শুক্‌নো লাগছে।"

"না না জর হয়নি, শুধু মাথা ধরেছে, এখ্‌খুনি সেরে যাবে।"

"তবে চ'না—বেড়িয়ে এলেই সেরে যাবে।"

চারুলেখা পেছন ফিরেই বল্লে—"আমার ভালো লাগছে না মা যেতে।"

মা একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বল্লেন—"এই বেলফুলের বাড়ী দিনে দশবার যাচ্ছিস্, আর আমি একটু বল্লেই যত আপত্তি।" বলে' আর কোনো সঙ্গীর সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু চারুর নির্জ্জনতা নিরুপদ্রবে ভোগ করা হ'ল না। মা না যেতে-যেতেই চিত্রলেখা ঘরে ঢুকে বল্লে,—"ও চারু! ওমা, দুপুর বেলা ঘুম হচ্ছে যে, ওঠ্।" তারপর বিছানায় বসে বল্লে—"এই মাসীমাদের বাড়ী গেলি, আবার এর মধ্যেই শুয়ে পড়্লি যে। আমি যাব বল্লুম, তাত কানেই গেল না।" চারুর কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে তার হাতে একটু চিম্‌টি কেটে বল্লে—"চ' নীচে তোমাদের কবি এসে বসে' আছেন। আমি ত বাপু কবিতার অর্থ একবর্ণও বুঝলুম না, তাই তোকে ডাকতে এলুম, নে ওঠ্।"

এইবার চারু মুখ বিছানায় গুঁজেই জিজ্ঞেস কল্লে—"উৎপল দা কতক্ষণ এসেছেন?"

"এই ত তুই আস্‌বার একটু পরেই। অমন করে মুখ গুঁজে শুয়ে আছিস্ কেন, যাবি না?"

এবার অশ্রু-সজল মুখটা কোনো রকমে একটু মুছে

চারুলেখা দিদির দিকে ফিরে মিনতি করে' বল্লে—"না আজ আমার মনটা ভারী খারাপ লাগ্‌ছে, তুমি যাও।"

"তোর আবার মন খারাপ রোগ কবে থেকে ধর্‌ল। ও একটু কবিতার টনিক্ খেলেই সেরে যাবে। দুর্বোধ কবিতার অর্থ হজম কর্‌তে আমার যদি মাথা না ধর্‌ত ত তোকে আর ডাক্‌তে আসতুম না,—আর" বলে' একটু হেসে চিত্রলেখা তার হাতে একটু চিম্‌টি কাট্‌লে।

কিন্তু এই চিম্‌টিটুকুর অকিঞ্চিৎকর ইঙ্গিতটিও আজ কোন দুর্জ্ঞেয় পথ দিয়ে গিয়ে চারুর মনের ব্যথার স্থানে অদ্ভুতভাবে আঘাত করলে চিত্রলেখার ঈপ্সিত অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত দিক দিয়ে।

চিত্রলেখা তখনও সেই চিম্‌টিটুকুর অপ্রত্যাশিত পরিণতি কিছুমাত্র না জেনে বলে' যাচ্ছিল—"ও ভাষার ভোজ-বাজির চেয়ে তোমার বধিরদার যন্ত্রের যাদুগিরী ঢের সহজ!" হঠাৎ অবাক্ হয়ে থেমে সে দেখলে চারুলেখা তার কোলে মাথা রেখে উদ্বেল কান্নার বেগ রোধ কর্‌তে না পেরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে!

পলকে নিজের ভাষা-চাতুর্য্যের কথা ভুলে গিয়ে চিত্রলেখা চারুর মুখের ওপর সস্নেহে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা কল্লে—"কি হয়েছে চারু?"

চারুর সমস্ত দেহ কান্নার প্রবলতায় কাঁপ্‌ছিল। চিত্রলেখার মনে হোল, এ কান্না তো সাধারণ কোনো কান্না নয়। এ কান্নার ভেতর এমন একটা বুক-ভাঙা হতাশার আভাস ছিল যে তার কারণ ভাল করে' না বুঝেও কি একটা কল্পনা করে' চিত্রলেখা অন্তরে শিউরে উঠ্‌ল। সে জান্‌ত এ কান্নার সান্ত্বনা দেওয়া যায় না, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে' কোনো ফল হয় না, ঠাট্টা করে' উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এমন কান্নার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য মানুষের জীবনে খুব কমই আসে! তাই সে আর কোন কথা না বলে' বোনের মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আকাশ-পাতাল ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

একটা কবিতা উৎপলের মুখ থেকে শোন্‌বার পর চিত্রলেখা উঠে "যাই বাবা, চারু কোথায় গেলদেখে আসি" বলে' উঠে গেছ্‌ল। তখন থেকে উৎপল সমস্ত কথাবার্ত্তার মধ্যে একটি সজাগ উৎসুক দৃষ্টি অন্নদাবাবুর কাছ থেকে যথাসাধ্য গোপন ক'রে দ্বারের পানে স্থাপন করে ব্যাকুল মনে প্রতীক্ষা কর্‌ছিল। অন্নদাবাবুই আজ বেশীরভাগ কথাবার্ত্তা কইছিলেন, সে মাঝে-মাঝে দু-একটা ছোটখাট মন্তব্য প্রকাশ কর্‌ছিল। অন্নদাবাবু বল্‌ছিলেন, "আজকালকার ছেলেদের চেয়ে

আমাদের কাব্যানুরাগ ছিল একটু সবল গোছের, মৌখিক যুক্তি অনেক সময়েই শারীরিক যুক্তিতে পর্য্যন্ত গড়াত। যাকে আমরা বড় করতুম, একেবারে স্বর্গে তুলে দিতুম, আর যাকে নাবাতুম একেবারে পথে বসিয়ে ছেড়ে দিতুম। কোনো কবির সম্বন্ধে তর্ক করতে-করতে শেষে পরস্পর পরস্পরকে কটূক্তি করবার ক্ষমতা দেখিয়ে তর্কের মীমাংসা হ'ত অনেক সময়। হুইট্‌ম্যান কবি কি কবি নয় এবং তিনি কবি কি সামান্য মানব-হিতৈষীএই নিয়ে হুইট্‌ম্যানের সপক্ষেও যে-সব যুক্তি প্রয়োগ করা হ'ত তা জানতে পারলে হুইট্‌ম্যান লজ্জায় বোধহয় অধোবদন হতেন। সকলেই অবশ্য এরকম ছিল না, কিন্তু তখন আবার সুধীরের মতন যন্ত্রের সঙ্গীত শুনতে খুব কম ছেলেই পারত। তোমাদের যুগটা যেন আমাদের চেয়ে অনেকখানি আলাদা। তোমাদের বয়সে আমাদের ভাবের উচ্ছ্বাস ছিল জ্ঞানের গভীরতার চেয়ে ঢের বেশী, কিন্তু আজকাল-কার ছেলেরা যেন জীবনটাকে গোড়া থেকে গম্ভীরভাবে দেখতে শেখে। পৃথিবীটা খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে।"

উৎপল বল্লে—"অনেকে ত আবার বলেন যে, আজ-কালকার ছেলেরাই সেকালের ছেলেদের চেয়ে বেশী shallow, তারা বড্ড বেশী কথা কয়।"

মাথা নেড়ে অন্নদাবাবু বল্লেন—"ও হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক নিজেকে বড় করে দেখবার প্রবৃত্তি। আজ-কালকার সাধারণ ছেলে যে সেকালে সাধারণ ছেলের চেয়ে সব শুদ্ধ ঢের বেশী অগ্রসর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।" তারপর একটু থেমে বল্লেন, "তোমার সঙ্গ পেয়ে আমি যে কি খুশী হই তা বল্‌তে পারি না। স্থধীরের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা না থাকলেও তার ও ঘরটিতে ঢুক্‌লেই আমার আনন্দ হয়,কিন্তু ওর অযথা সময় নষ্ট করে' বাজে প্রশ্ন করে' বিরক্ত করতে ভরসা হয় না। ও বোধ হয় বেশী কোথায় বেরোয়-টেরোয় না!"

অন্নদাবাবুর কথায় মনে মনে এতদিন স্থধীরের বাড়ী যাওয়া প্রায় এক রকম বন্ধ করায় ও বন্ধুর প্রতি এতদিনের অনিচ্ছাকৃত অবহেলার কথা স্মরণ করে' উৎপল লজ্জিত হয়ে উঠ্‌ল, বল্লে—"না, ওর পৃথিবীর আর কোনো বিষয়ে বিশেষ আসক্তি দেখা যায় না। ছবি সাহিত্য এ সবে ওর বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই, শুধু গানটা ও খুব ভালোবাসে।"

অন্নদাবাবু বল্লেন, "গান না ভালোবেসে যে মানুষ পারেই না। ওহোঃ, তোমায়ত আমার মেয়েদের গান-

শোনান হয় নি, তুমি রোজ কবিতা শুনিয়ে যাও, আজ একটু গান শোনো।"

অন্নদাবাবু ডাক্‌লেন—"ছবি! চারু!" তারপর উৎপলের দিকে চেয়ে বল্লেন, "ছবির গলার স্বাভাবিক মিষ্টতা বেশী, কিন্তু গান শিখেছে ভালো চারু।"

কারুর কোনো সাড়া না পেয়ে বল্লেন, "ছবি এতক্ষণ ছিল না এখানে?"

উৎপল বল্লে, "না তিনি ভেতরে চারুকে ডাকৃতে গেছেন অনেক্ষণ।"

অন্নদাবাবুর ডাকে তুজনে যখন ঘরে এসে ঢুকল তখন তুই বোনের মুখেই এমন একটা অসাধারণ বেদনার ছায়া ছিল যে অন্নদাবাবু তা লক্ষ্য না কর্‌লেও উৎপল লক্ষ্য করে' অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল।

অন্নদাবাবু বল্লেন, "বা, তোরা রোজ উৎপলকে ডাকিয়ে আনিয়ে বিরক্ত করিস্ আর ওকেত একদিন নেমন্তন্নও কর্‌লি না..."

উৎপল বল্লে, "বাঃ, কোন্‌দিন আপনারা না খাইয়ে ছেড়েছেন বলুন ত!"

অন্নদাবাবু বল্লেন, "না একদিন উৎপলকে আর

সুধীরকে ভালো করে' নেমন্তন্ন করতে হবে, কালই হোক্ না, ক্ষতি কি ?"

চারু হঠাৎ বাধা দিয়ে বল্লে, "কিন্তু অধীরদা ত আস্‌তে পারবে না।"

অন্নদাবাবু বল্লেন, "কেন ?"

"তিনি নতুন কারখানা খুলছেন, তাঁর কাজে ভয়ানক ব্যস্ত, এখন তাঁর সময় নেই।"

"কারখানা খুলছে নাকি সুধীর ?" অন্নদাবাবু ও উৎপল একসঙ্গে বলে' উঠ্‌লেন।

"আমি জানি সুধীর সাধারণ ছেলে নয়। কিন্তু তা হলে আর ওকে এখন বিরক্ত করে' কাজ নেই। উৎপল, কালই তোমার নেমন্তন্ন রইল বাবা এখানে"—তারপর মেয়েদের দিকে ফিরে বল্লেন, "আজ উৎপলকে একটু গান শুনিয়ে দাও ত মা। এস ছবি।"

ঘরের কোণের অর্‌গ্যানটায় বসে' চিত্রলেখা গাইলে—

"সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেচ,
তোমায় করিগো নমস্কার..."

উৎপল বল্লে, "আপনার গলা খুব মিষ্টি ত !"

অন্নদাবাবু বল্লেন,—"ওর গলা খুবই ভালো, কিন্তু

ও ত আর ভালো করে' শিখ তে পার্‌লে না। এইবার তুমি একটা গাও ত মা।"

চারু আর্‌গ্যানে বসে' জিজ্ঞেস কল্লে—"কি গাইব বাবা ?" প্রশ্নটা যেন অত্যন্ত করুণ শোনালে।

অন্নদাবাবু বল্লেন—"তোমার যেটা ভালো লাগে—না হয় একটা হিন্দুস্থানীই গাও।"

চারুলেখা খানিকক্ষণ 'কি'গুলো নাড়াচাড়া করে' গাইলে..."ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এস.. "

গান শেষ না-হওয়া অবধি উৎপলের তন্ময়তায় এমন একটি নিবিড়তা ছিল যে অন্নদাবাবুও তা লক্ষ্য না করে' পার্‌লেন না এবং চিত্রলেখা সে তন্ময়তা শুধু গানের দরুণ নয় বুঝতে পেরে চারুর সম্বন্ধে তার দুর্ভাবনার একটা কিনারা পেয়ে অত্যন্ত আশ্বস্ত হ'ল।

উৎপল বিদায় নিয়ে গেলে চিত্রলেখা চারুকে একলা পেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে তাকে চুমু খেয়ে বলে, "দুষ্টু মেয়ে, দিদি কিছু বুঝ্‌তে পারে না, না ?"

পনেরো

লেখাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে উৎপল অপরূপ ভুবনের সুষমা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। মেঘ্‌লা আকাশের ঘোলাটে থম্‌থম্ কেটে গিয়ে অশেষ নীলিমার স্বপ্ন পারাবার উতল হয়ে উঠেছে, তার মুখের পানে চেয়ে জ্যোতির অভিনন্দন পাঠাচ্চে নক্ষত্রপুঞ্জ, নগরীর ধূলি-চিহ্নিত পথ তার পায়ের নীচে জল-তরঙ্গের গৎ হয়ে বেজে চলেছে, প্রকৃতির বাণীকে এমনভাবে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে উৎপল আর কোনোদিন অনুভব করেনি এ জীবনে। সে ভাবছিল, সত্যিই সে কবি, সুন্দর, ধরিত্রীর বুকের দুলাল, দেবতা, সে নিজেকেই যেন নিজে চিনে উঠ্‌তে পাচ্ছিল না।

রাস্তার মোড়ে একটা ভিখারী করুণস্বরে ভিক্ষা জানাচ্ছিল, অন্যদিন হলে উৎপল লক্ষ্য না করেই চলে' যেত, কিন্তু আজ তার মনে হচ্ছিল এ প্রার্থনাটি এড়ালে

তার অন্তরের আনন্দ দেবতাকে অপমান করা হবে, সে তার পাঞ্জাবীর পকেট উজার করে' সমস্ত কিছু ঢেলে দিলে ভিখারীর হাতে। ভুবনেশ্বর অক্লান্ত দানের বর্ষায় তাকে ধন্য করেছেন, তাঁর দানের অমৃতের একটি কণাও বণ্টন করে' দিতে না পারলে সে দানের মর্য্যাদা থাকে কৈ? রাস্তার ধারের 'ডাষ্টবিন' ও 'গ্যাস্‌পোষ্ট' তার দিকে চেয়ে যেন বন্ধুর মতন হাস্‌ছে ও তাদের আনন্দ জানাচ্চে। তার চুলে রাতের স্নিগ্ধ বাতাসটি আদরে দোল খাচ্ছিল, ও তার সমস্ত গায়ে হাত বুলিয়ে যেন বল্‌ছিল—খুশী হয়েছি। দিশাহারা হয়ে আপন আনন্দে সে পথ চল্‌ছিল, হঠাৎ অন্ধকার একটী গলির মোড়ে গ্যাসের তলায় সে একটি নারীকে দেখে চম্‌কে উঠ্‌ল। অন্যদিন হলে সে হয়ত ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে' যেত, কিন্তু আজ সে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ তার মুখখানি দেখ্‌লে, কার যেন অপরাজিতার মতো স্নিগ্ধ সুন্দর মুখের আদল ফুটে উঠ্‌ছে এ ম্লান দুঃখী মুখের ছায়ায়! সে অন্তরে-অন্তরে এই রহস্যময়ী অভাগিনীকে প্রণাম করে' পথ চল্‌ল।

হঠাৎ একটা চলন্ত দ্রুত মোটর গাড়ী পথের ঠিক ঠাহর করতে না পেরে রাস্তার একটা কুলির গায়ের ওপর

হুড়্মুড়্ করে' পড়ে' তাকে দলিত নিষ্পেষিত করে' খানিকটা এগিয়ে থেমে পড়ল। মুহূর্ত্তে একটা অতি কান্নার রোল একটা বীভৎস চীৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট জনতা জমে গেল নির্য্যাতিত লোকটিকে ঘিরে। বেচারী পথিকটি নিশ্চিন্তচিত্তে পথ অতিক্রম কর্ছিল, তার ওপরে এ কি অন্যায় ভয়ঙ্কর উপদ্রব। যন্ত্রের একি ক্রূর বীভৎসতা —নিষ্ঠুর অত্যাচার! তার মনে পড়ল তার বড়দার বাঁশীটির কথা। এমন রাতে তিনি হয়ত নিরালায় বসে' সেটি বাজাচ্ছেন। সৌন্দর্য্যশিল্পীর হাতের এ বাঁশীতো কাউকেও মারে না, বরং সবাইকে খুশী করে' তোলে! উৎপলের মন ব্যথায় ভারী হয়ে উঠ্ল, জনতা ঠেলে মুমূর্ষুকে দেখ্বারও তার ক্ষমতা ছিল না, সে আবার তেম্নি পথ চল্ল।

এই সূত্রে হঠাৎ তার মনে পড়ে' গেল যন্ত্র-তান্ত্রিক সুধীরের কথা। লেখাদের বাড়ীতে অন্নদাবাবুর সঙ্গে কথায়-কথায় সুধীরের কথা উঠ্লে সে মনে মনে স্থির করেছিল একবার সুধীরের যন্ত্র-ধ্যানে একটু গোলমাল বাধিয়ে সে আস্বেই। কিন্তু এই আকস্মিক উৎপাতের পরে তার সুধীরের ওপর কেন যেন ভারী রাগ হতে লাগল। সে এমন কি একটু বিচার করে' দেখ্বার ধৈর্য্য পর্য্যন্ত

পেলে না, এ অকারণ ক্রোধ কেন? তার শুধু মনে পড়ল অনেকদিন আগের সেই অশ্রু-ভারাতুর কালো দুটি চোখের অপরূপ একটি কাকুতি, সেই ব্যথা-গভীর মুখের ক্লান্ত ম্লান কান্তিটি। তার মনে হোল ঐ মুখে ব্যথার ছাপ দেগে দেবার জন্যে অপরাধী সুধীর। তার আরো মনে হোল, যেদিন লেখা তাকে অযাচিত আনন্দে চমকে দিয়ে সুধীরের ঘর থেকে টেনে নিয়ে যায়, সেদিনকার তার সেই অদ্ভুত ব্যবহারে সুধীরের কঠোর নিষ্ঠুরতা বা মর্ম্মহীন ঔদাসীন্যের আভাস প্রচ্ছন্ন ছিল। তারপর উৎপল যে লেখাকে এক গভীর লজ্জা থেকে বাঁচালে সেটা লেখার অপমানিত বা প্রত্যাখ্যাত হবার লজ্জা থেকেই বাঁচানো। যাকে সে অসীমের অভিব্যক্তি বলে' কল্পনা করে' পূজা করে তাকে কেউ তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা করে এমন আস্পর্দ্ধা সহ্য কর্‌তে সে কিছুতেই পার্‌ছিল না। সুধীরের মুখে লেখার নামের সে অসভ্য বিকৃত উচ্চারণটা পর্য্যন্ত তার কাছে অসহ্য লাগ্‌ছিল, ঐ শব্দটা যেন তার প্রাণহীন যন্ত্র-রাক্ষসের একটা কর্কশ আওয়াজ!···বিভিন্ন চিন্তার দোলায় দুল্‌তে-দুল্‌তে উৎপল যখন দর্জ্জিপাড়ায় তাদের বাড়ী এসে পৌছল তখন তার 'রীষ্টওয়াচে' বারোটা বেজে গেছে।

নীচের ঘরে ন-দা পার্ট মুখস্থ কর্‌ছিলেন চেঁচিয়ে,

তার সেজদা তাই শুনচিলেন ও দু-একটা নতুন ভঙ্গীর ইসারা দিচ্চিলেন। উৎপল ঘরে ঢুক্‌তেই সেজদা চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌লেন—"এই যে উৎপল! কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আমরা তো ভেবে ভেবে হায়রান্।"

ন-দা হেসে বল্লেন—"পথে কিছু মিলেছিল নাকি কবিতার খোরাক?"

উৎপল হেসে বল্লে, "সত্যি ন-দা, কোহিনুরের সন্ধান পেয়েছি, আলাদীনের প্রদীপ।"

"এঁ্যা! সত্যি? কেল্লা মার দিয়া! কোহিনুর? গলায় পড়্‌চিস্ কবে রে?"

"এ থিয়েটারের রিহার্সাল হয়, সত্যি!"

উৎপলের গলার স্বর শুনে মেজদা এসে বল্লেন—"ভাত একেবারে জুড়িয়ে গেছে। খাবি চ, তুই আসিস্‌নি বলে' আমরা কেউ এখনো খাইনি!"

সেজদা বল্লেন—"আর উৎপলের খাওয়া মেজদা! একেবারে কোহিনুরের অধীশ্বর, জাহাঙ্গীর।"

উৎপল বল্লে—"বেশ, কোহিনুর পেলে বুঝি আর ক্ষিদে পেতে নেই? এসো তোমরা..." বলে চল্‌তে যাচ্চিল, মেজদা তার হাত ধরে' বল্লেন—"কি উৎপল, একেবারে আমাদের ডিঙিয়ে?" উৎপল হেসে বল্লে—"পাগল হয়েচ মেজদা?

শুধু সন্ধান পেয়েচি মাত্র, কিন্তু জান, সে সাত রাজার ধন একমাণিক, তাকে কি অম্‌নি হাত পাত্‌লেই পাওয়া যায় কখনো ?" বলে' ওপরে চলে' গেল।

ন'দা পার্টের তাড়াটা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বল্লেন—"রইল আমার রিহার্সাল! আজ উৎপলের কবিতার ভক্ত সেজে তারিফ্‌ বাহবা দিয়ে আস্তে-আস্তে নাম-ধামটা জেনে নিতেই হবে।" তার বস্‌বার থিয়েটারী ভঙ্গীতে সবাই হাস্‌তে লাগল।...

সুষুপ্ত বিভাবরী তখন অন্ধকার ভবিষ্যতের মতো নিথর নিস্পন্দ অনিশ্চিত নিরপেক্ষ হয়ে আছে—ধরণী ও আকাশকে অন্তহীন অক্ষুব্ধ তিমিরে আছন্ন করে'।

ষোল

ছাই রঙের দামী একখানা শাড়ী পড়ে, দরজার কাছে আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে চারুলেখা কাঁধের কাছে আঁচলে ধারের কাপড়গুলি সেফ্‌টিপিন্‌ দিয়ে আঁট্‌বার বৃথা চেষ্টা কর্‌ছিল খানিকক্ষণ ধরে'। এমন সময় বিলিতি জুতোর মশ্‌মশ শব্দ করতে-কর্‌তে উৎপল সেখানে এসে হাজির হোলো। উৎপলের এ-বাড়ীতে গতিবিধির এখন আর কোনো নিষেধ—কোনো অবরোধ নেই।

উৎপলকে আস্‌তে দেখেই চারু একটু এগিয়ে এসে মিষ্টি সুরে বল্লে, "আঁচলটা সেফটিপিন্‌ দিয়ে এঁটে দিন্‌ না উৎপলদা, আজ সকালে বঁটিতে বাঁ হাতের আঙ্গুলটা কেটে ফেলেচি, একহাতে পাচ্চি না আঁট্‌তে।"—বলে' সে তার স্থুঁচলো রাঙা চাঁপার পাপড়ির মতন সুন্দর আঙ্গুলটি উৎপলকে দেখালে।

উৎপল আরো এগিয়ে এসে বাঁ হাতে শাড়ীর আঁচলটা

ধরে' সোণার সুদৃশ্য সেফ্‌টিপিন্‌টা তাতে আঁট্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল, কিন্তু প্রায় দু মিনিট কসরৎ করে'ও পেরে উঠল না। তার সমস্ত দেহ রক্তের প্রলয়ে কাঁপচিল। লেখার চুলের গন্ধ ও বুকের নিশ্বাসটির সে ঘ্রাণ পাচ্ছিল, কে যেন তার বুকে এসে আনন্দের মৃদঙ্‌ বাজিয়ে চলেচে তাকে চঞ্চল উন্মত্ত করে'। সে যে দুর্জ্জয় ধূর্জ্জটিকে আকাশের মেঘাচ্ছন্ন বন্ধুর পথে ধ্বংসের অভিসারে যাত্রী হবার কল্পনা করেছিল সেই প্রলয়ঙ্কর মহেশ্বর আজ যেন অবতীর্ণ হলেন তার শিরা উপশিরার পথে-পথে।

চারু হেসে বল্লে—"যান, আপনি কোনো কর্ম্মের নন্‌। একটা সেফ্‌টিপিন্‌ আঁট্‌তে পর্য্যন্ত শেখেন নি। কবিগুলো কোনো কাজে আসে না। অধীর-দা হলে আর কিছু না হোক কাঁধে একবার সেফ্‌টিপিনের খোঁচাটা অন্ততঃ লাগিয়ে দিতেন। যাই দিদির কাছে। বসুন, মা চা আনচেন।" বলে' চারু চলে' গেল।

বেশীদূর যেতে হোল না, সাম্‌নে দাঁড়িয়ে চিত্রলেখা চারু আর উৎপলকে দেখছিল। চারু আস্‌তেই চিত্রলেখা সুস্পষ্ট অর্থপূর্ণ একটি হাসির ইসারা কর্‌ল। সে ইসারাটি চারুলেখা বুঝতে পেরে গম্ভীর হয়ে গেল। এ সুন্দর গাম্ভীর্য্যে খুশী হয়ে চিত্রলেখা বল্লে—"দে, আমি লাগিয়ে দিচ্চি।"

চিত্রলেখা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল পরস্পরের সান্নিধ্যের স্বাদানুভব করে' দুজনেরই মুখ আনন্দময় ব্রীড়ায় রাঙা হয়ে উঠেচে,—উৎপলের মুখে ধ্যানীর তন্ময়তা, সাধকের নিবিড়তা, আর চারুর দুইটি চোখে ললাটে কপোলে অপরূপ লাবণ্যময় হ্রী ও শ্রী মাখানো! চিত্রলেখার বুক তৃপ্তিতে ভরে' গেল, চারু ও উৎপলকে সে নতুন মহিমায় মহিমান্বিত করে' দেখলে।

মুখে হাসি টেনে আবছা গলায় সে বল্লে,—"দুটি হাতের স্পর্শের চাইতে সেফ্‌টিপিনের খোঁচা বুঝি বেশী ভালো, বোকা মেয়ে?"

চারুর মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না, শুধু তার মুখের গাম্ভীর্য্যের ছায়াটি আরো নিবিড়তর হয়ে এল।

চিত্রলেখা বল্লে—"যা বাবাকে বল্ গে যা, ট্যাক্সি আনাতে কাউকে দিয়ে। আমি যাচ্ছি, মা উৎপলের চা নিয়ে যাচ্ছেন, যা।"

চারু নীচের থেকে ঘুরে' এসে বল্লে—"বাবা যাবেন না বল্‌চেন দিদি। বল্লেন, উৎপল একাই নিয়ে যেতে পারবে।"

পাশের ঘরে চা খেতে খেতে উৎপল চারুলেখার মুখে তার নামের এই পদবীবিহীন উচ্চারণটি শুনে ভারী খুশী হোল।

চারু ঘরে এসে হেসে বল্লে—"নিয়ে যেতে পার্‌বেন একলা? বাবা যাবেন না বল্‌চেন।"

উৎপল গম্ভীর হয়ে বল্লে—"কি জানি, কবি মানুষ, যদি ভাবের ঘোরে চিৎপাত হয়ে পড়ে যাই মোটরের তলায়!"

"আপনিও আর সবাইর মতন রাগ করেন দেখছি। না না আপনি খুব পার্‌বেন, সব পারেন, ভালো পারেন। হল ত?" বলে' আঁচলের একটা ঘুর্ণি দিয়ে সে চলে' গেল।

ট্যাক্সিটা এলে চিত্রলেখা চালাকী করে' আগে উঠে পড়ে' এক ধারে গিয়ে বস্‌ল; তারপর উঠ্‌ল চারু। উৎপল ইতস্ততঃ কর্‌ছিল, অন্নদাবাবু বল্লেন, "উঠে পড়।"

উৎপল ড্রাইভারের পাশে বস্‌তে যাচ্চিল, চিত্রলেখা বল্‌লে—"সে কি! এখানে আসুন।" বলে' চারুকে নিজের কাছে একটু টেনে নিলে। উৎপল চারুর পাশে বস্‌লে চিত্রলেখা চারুর কব্জিতে ছোট একটু চিম্‌টি কাট্‌লে।

অন্নদাবাবু ড্রাইভারকে বল্লেন—"পিক্‌চার প্যালেস্।"

মোটর ছুট্‌ল, আপন চিন্তায় বিভোর উৎপল ও লক্ষ্যহীন চিত্রলেখা কেউ দেখ্‌তে পেলে না, কিন্তু সন্ধান-তৎপর চারুলেখা দেখতে পেলে তার মুখের

ওপর তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ-দৃষ্টি হেনে ফুট্‌পাথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার অধীরদা। তার বুকের সমস্ত রক্ত যেন একবার থম্‌কে দাঁড়াল। যে খুশীর মায়াপুরীটি নিজ মনে সে গড়ে' তুলেছিল এতক্ষণ ধরে' তা যেন ভেঙে চুরমার্ হয়ে গেল এক নিমেষে। তার কিছু আর ভাল লাগ্‌ল না, 'কুগান' ফিল্মের সদ্যজাগ্রত মোহটা তখুনিই মিলিয়ে গেল আকাশে।

কাল হাজার চেষ্টা করে'ও চারুর ঘুম হোল না, আজ সকালবেলা থেকে উঠে তার ভারী দুর্ব্বল লাগছিল। আজ দিদি চলে' যাবে ভোরে। চারু খাটের ওপর চুপ করে' বসে ছিল, আবার অকারণ তার দুই চোখের কোণে শিশিরের মতো অশ্রু জমে' উঠ্‌ছে! চিত্রলেখা চলে' গেলে কি করে' তার দিন কাট্‌বে? না—দিনগুলি কাটবে না আর। চারুলেখা নীচে দর্‌জার গোড়া পর্য্যন্ত দিদিকে এগিয়ে দিয়ে গড় হয়ে তাকে প্রণাম কর্‌লে। চিত্রলেখা ছোটবোনকে সস্নেহ আদরে বুকে জড়িয়ে ধরে' মা-বাবার একটু আড়ালে টেনে নিয়ে তার অশ্রুভরা চোখে একটি চুমু দিয়ে অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে বল্লে—"উৎপলের প্রেমকে কোনো দিন তাচ্ছিল্য করিস্‌নি চারু। জগতে এ-রকম ভালোবাসা একেবারে দুর্লভ।"

সতেরো

মা যখন কথায়-কথায় বল্লেন, চারু সেদিন সুধীরকে খুঁজতে এসেছিল এ-বাড়ী, বেচারী দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে বাসি ফুলের পাপ্‌ড়ির মতন, তখন সুধীর সকল অবসাদের আলস্য থেকে এক ঝট্‌কায় উঠে পড়ে' মার মুখের পানে চেয়ে বেদনার্ত্ত তীব্র কণ্ঠে শুধোলে—"আমায় এতদিন জানাও নি যে সে-কথা ?"

মা ছেলের এই অদ্ভুত তীক্ষ্ণ কটু কণ্ঠ শুনে মনে মনে একটু আশ্চর্য্য হলেন। তিনি বুঝতে পাচ্ছিলেন, সুধীরের এই চাঞ্চল্য ও অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের মূলে শুধু কারখানার উদ্বেগই ছিল না, কি যেন একটি সুগোপন বেদনা তাকে নিরন্তর পীড়িত করছে। তিনি ভাবলেন, হয়ত চারুর সঙ্গে সুধীরের কোনো ঝগড়া হয়েছে, নইলে যে-চারু দিনে চার-পাঁচ বারের কম আস্‌ত না, সে এখন কদাচিৎ আসে এখানে, আর উৎপলও আসে না আজকাল।

মা সুধীরের এই অস্বস্তির কারণ অনুসন্ধান করতে যাচ্ছিলেন, সুধীর আবার কর্কশকণ্ঠে বল্লে, "আমি বুঝি সংসারের কেউ নই, আমাকে খবর দেবার কিছুই দরকার বোঝ না তুমি!"

মা বল্লেন, "এ আবার এমন কি কথা যে তোকে ছুটে গিয়ে তক্ষুনিই বলতে হবে?"

"না, এ দরকারী হতে যাবে কেন, দরকারী কথা হবে তোমার কার বাড়ীতে বেড়াল-ছানা মরল, কোন্ বাড়ীর বৌ শুক্তোতে লঙ্কা দিয়েছে?"

মা সুধীরের এই অদ্ভুত ধরণের কথা কওয়া শুনে হাসি চেপে বল্লেন, "তুই তখন কারখানা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলি যে তোকে তখন বাড়ীতে প্রায়ই পেতুম না, মনেও ছিল না আমার।"

সুধীর খানিকক্ষণ চুপ করে' রইল, পরে খাট থেকে নেমে জুতো পরতে সুরু করলে। মা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বল্লেন, এই রোদ্দুরে আবার কোথায় যাচ্ছিস্? চারুদের বাড়ী?"

সুধীর জুতোর ফিতে বাঁধতে-বাঁধতে বল্লে, "বয়ে গেচে আমার ওর বাড়ী যেতে। আমি চল্লুম কারখানায়।"

"কারখানায়? এই তো এলি সেখান থেকে। একটু জিরিয়ে যা, এরকম করলে অসুখ করবে যে ভারী!"

তিক্ত কণ্ঠে সুধীর বল্লে, "করুক গে অসুখ। আমার কার্‌খানায় অনেক কাজ পড়ে' আছে, না গেলেই নয়।"

মা পেছন থেকে বল্লেন, "বিকেলের খাওয়াটা খেয়েই না হয় যেতিস্। অনেকদিন উৎপল আসে না, আজ আস্‌বে হয়ত।"

"উৎপল এলে আস্‌বে, আমার তাতে কি?"—বলে' সুধীর তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

কিন্তু সে ঠিক কার্‌খানার উল্টো পথে হাঁট্‌তে সুরু কর্‌লে, তার মগজে চিন্তার জট্ বেঁধে গিয়েছে। চারু সেদিন তাকে খুঁজতে এসেছিল কেন, এমন কি কথা তার বল্‌বার আছে? সুধীর নানা প্রশ্ন করে'ও কোনো উত্তর পাচ্ছিল না। আরো ভাবছিল, উৎপলটা আর আসে না কেন? চারু না হয় আজকাল একটা প্রকাণ্ড লোক হয়ে পড়েচে যে তাকে একটু বক্‌লে বা রেগে কথা কইলে সে রাগ করে' আর ঘরে আসে না, কিন্তু বন্ধু উৎপলের প্রতি সে কি অপরাধ করেছে? তার কোন্ অপরাধের শাস্তি দেবার জন্য উৎপল আর চারু একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে' এই নিষ্ঠুর ধর্ম্মঘটের আয়োজন করেছে? সুধীর রাস্তার যন্ত্রের আর্ত্তনাদ থেকে নিজের চিন্তার ধারার সংযম রাখতে একটা নির্জ্জন পার্কে ঢুকে পড়ে একটা

বেঞ্চিতে গিয়ে বস্‌ল। হঠাৎ তার মনে পড়ল সেই স্বল্পান্ধকার গলিটার মোড়ে সেদিন উৎপলের সেই আনন্দোজ্জ্বল দীপ্ত দুটি চোখ আর সেই দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে চারুর সেই বিদায়-ব্যথাতুর উদাসীন মূর্ত্তিখানি! চারুর হাতে যে একখানি বাঁধানো খাতা ছিল সেটি পর্য্যন্ত সুধীরের চোখ্ এড়ায়নি। অনেকদিন তার যন্ত্র-যাদুঘরে উৎপল ওই মোটা সুদৃশ্য খাতাটি এনে তার কবিতা আওড়ে তার ধ্যান ভাঙ্‌বার বৃথা চেষ্টা করেচে, এই খাতাটিকে সুধীর বেশ চিন্‌ত। সেই খাতাটি সুধীর কতদিন দেখতে চেয়েছে, বলেছে 'আমার এই জলন্ত আগুনের বয়লারেই এর স্থান'—কতদিন কবিতাগুলি পড়বে বলে অনুনয় করেচে, কিন্তু উৎপল তার হাতে তা দ্যায়নি, বলেচে—'এই যন্ত্র-কাপালিকের হাতের ছোঁয়া লেগে আমার কাব্য নোংরা হয়ে যাবে'—সেই কবিতার খাতাটা চারুর হাতে! অকস্মাৎ চারুর প্রতি নিরুদ্ধ অভিমানের বেগ জ্বলন্ত অগ্ন্যুৎপাতের মতন ক্ষেপে উঠে একেবারে উৎপলকে গ্রাস করে' বস্‌ল। সুধীর ভাবলে—সমস্ত অপরাধের মূলই হচ্চে এই উৎপল। সে নানা চাতুর্য্য ও লীলা-কৌশলের আয়োজন করে' তার ও চারুর মধ্যে এই বিচ্ছেদের প্রাচীর গেঁথেছে। কথার কাঙাল তরলমতি মেয়েটা

হয়ত উৎপলের ভাষার ও ভাবের ফানুসে, কথার বর্ণজালে বন্দী হয়ে রয়েছে, তাইতো চারু আর আসে না, উৎপল তাকে আগলে রেখেছে। তার সমস্ত মন উৎপলের প্রতি আক্রোশে ফুলে উঠল। সেদিন উৎপল চারুকে ভালো লাগে বল্‌লে সুধীর ঠাট্টা করে' উড়িয়ে দিয়েছিল, এখন সে যা উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌লে তাতে রেগে ক্ষেপে উঠবার তার যথেষ্ট কারণ আছে। তার খালি এই কথাই মনে পড়ছিল, উৎপল দস্যুর মতো তার ঘরে ঢুকে জোর করে' তার সর্ব্বস্ব হরণ করে' নিচ্চে, সে দুর্ব্বল বলেই তো তাকে বাধা দিতে পাচ্ছে না। না, সুধীর হঠাৎ বেঞ্চিটার থেকে উঠে পড়ল। সে ভাবলে, এখুনি চারুদের বাড়ী গিয়ে এর একটা পরিস্কার বোঝাপড়া করে নিতে হবে, আজ সে কোন কারণেই ফিরে আস্‌বে না, আস্‌বে না।

দিনের আলো তখন ঢলে পড়েছে আকাশের পশ্চিম ধারটাতে। সুধীর মনে মনে একটি স্বস্তি অনুভব কর্‌তে কর্‌তে চারুদের বাড়ীর মুখে পথ চল্‌ল। এই পথটা তার ভারী আরামে কেটে গেল, যন্ত্রের কোলাহল স্নিগ্ধ আলোর মায়ার সঙ্গে তার চিন্তা-তপ্ত মনে যাদুদণ্ডের মোহ-স্পর্শ বুলিয়ে দিল। কিন্তু চারুদের বাড়ীর সাম্‌নে রাস্তায় নাম্‌তে-না

নাম্‌তেই যে-দৃশ্য তার চোখ ধাঁধিয়ে টাটিয়ে দিল সে দৃশ্যের নিষ্ঠুর উপহাসের আর যেন তুলনা নেই। উৎপল চারুকে দামী সিল্কের শাড়ীতে সাজিয়ে পাশে বসিয়ে মোটরে করে' হাওয়া খেতে যাচ্ছে! একটা বিরাট মুষলের ঘা এসে তার বুকে বাজল, তার দৃঢ় দেহের মাংসপেশীগুলো বিপুল বেদনায় টন্ টন্ করে উঠল। বজ্রাহতের মতন খানিকক্ষণ বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তার সমস্ত দেহে ক্রোধের আগুন লেলিহান হয়ে উঠল। তার ইচ্ছা হোল ছুটে গিয়ে মোটরটাকে টেনে ধরে' এক ঝাকানিতে উৎপলকে গাড়ী থেকে নামিয়ে তাকে তীব্র তপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—চারুকে পাশে নিয়ে এমন করে বেড়াতে যাবার তার কি অধিকার আছে,—কিসের দাবী?

আঠারো

সুধীর কার্‌খানাতেই গেল। মিস্ত্রীরা তখন জামা কাপড় ঝেড়ে ঘরে ফের্‌বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দরোয়ান সেলাম করে' বল্লে—"আপনার জরুরি চিঠি এসেছে, আমিত আপনার বাড়ীই যাচ্ছিলুম চিঠি দিতে।"

অন্যমনস্ক ভাবে চিঠিটা হাতে নিয়ে সুধীর আফিস্ ঘরে গিয়ে বল্লে—"আমি এখন কিছুক্ষণ এখানে থাক্‌ব, কার্‌খানা খোলা থাক্।"

চেয়ারে তার শিথিল দেহ এলিয়ে দিয়ে সে নিজেকে এতদিন বাদে একবার ভাল করে' বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিল। বাইরের জগতের বিক্ষিপ্ত মনকে একবার অন্তরে সংগ্রহ করে' আপনাকে চিন্‌তে চেষ্টা কর্‌লে। যতদিন সে পৃথিবীর জড়শক্তি জয় করবার প্রয়াসে তন্ময় হয়ে ছিল ততদিন তার অন্তর যে ভুখা হয়ে হাহাকার করছিল কেন, তা সে আজ প্রথম যেন ভাল করে' ধর্‌তে পার্‌লে। একজন

মিস্ত্রী এসে বল্লে—"বাবু, আব্‌দুল ত মারা গেছে ; আরেক-জন হেড্‌ মিস্ত্রীর দরকার।"

স্থধীর বল্লে—"আচ্ছা, যাও!"

মিস্ত্রী তবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার বল্লে, —"কলের করাতের কাজ আজ আর কিছু করতে পারিনি।"

স্থধীর এবার রেগে উঠে বল্লে,—"কেন পারনি, তোমাদের কি বসে' থাক্‌বার জন্যে মাইনে দিই?"

মিস্ত্রী সন্ত্রস্ত হয়ে বল্লে,—"আব্‌দুল নেই, তা ছাড়া 'লেদের' একটা 'লিভারে' ভয়ানক 'জাম্‌' ধরে' গেছে, লিভার কিছুতেই—"

স্থধীর তার কথা শেষ না হতে দিয়েই ধমকে বল্লে, —"মাথা আর মুণ্ডু হয়েছে! তোমরা এতগুলো লোক কি করতে ছিলে এখানে?"

মিস্ত্রী সভয়ে বল্লে,—"আজ্ঞে সেটা এমন কোণের দিকে যে দু'জনের বেশী দাঁড়ান যায় না, আমরা ত কত চেষ্টা করলুম।"

স্থধীর উঠে বল্লে,—"চল, কি হয়েছে দেখি।"

অন্যান্য মিস্ত্রীরাও সেখানে জড় হয়েছিল। তারাও স্থধীরকে 'লিভার' টেনে ছাড়াতে উদ্যত দেখে বল্লে,—

"ও হবেনা হুজুর, আমরা সবাই অনেক চেষ্টা করেছি।"

একটা হেঁচ্‌কায় লিভারটাকে মুক্ত করে' সুধীর বল্লে, —"ছাই করেছ! আর গায়ের জোর ছাড়া অন্য পথ কি ছিল না?"

মিস্ত্রীরা অবাক্ হয়ে মুখ-চাওয়া-চায়ী করছিল। একজন বল্লে,—"আজ্ঞে আব্‌দুল নেই বলে' আমরা কলকব্জা কি নষ্ট হয় ভয়ে অন্য কিছু খুল্‌তে সাহস করিনি!"

সুধীর তাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—"আবদুল নেই কি রকম?"

সেই মিস্ত্রীটি তখন বল্লে,—"আপনাকে ত বল্লুম হুজুর আব্‌দুল মারা গেছে।"

হঠাৎ সুধীরের মাথার চুল কে যেন সবল মুঠিতে ধরে' তাকে এক বিষম নাড়া দিয়ে সচেতন করে' তুল্‌লে। কালও যে সদাহাস্যময় তরুণ বুদ্ধিমান মিস্ত্রীটি উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে' গেছে, আজ সে নেই!

সুধীর অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বল্লে—"মারা গেছে?...কালও ত সে এসেছিল, না?"

—"আজ্ঞে হাঁ, আজ সকালে রেলের লাইনে গলা দিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে।"

সুধীরের মনে হল অসম্ভব! ওই মিস্ত্রী মুসলমান যুবকটির বুদ্ধির প্রাখর্য্যে, তার কর্ম্মপটুতায়, তার সুগঠিত দেহের সবল পৌরুষে সত্যি সুধীর তাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাস্ত। সেই সদানন্দময় যুবক আত্মহত্যা করবে কি দুঃখে?

সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কেন?"

আবদুলের পাড়ায় যে-মিস্ত্রীটি থাকৃত, সে বল্লে,—"আজ্ঞে ওর একজনের সাথে 'নিকা' হবার কথা হচ্ছিল, সব ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে গেছ্‌ল, আর পনেরোদিন বাদে 'নিকা' হবে, হঠাৎ সেই ছুঁড়িটা কাল দুপুরে আরেক জনের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।"

সকলেই বলে' উঠ্‌ল—"শুধু এই জন্যে?"

বক্তা মিস্ত্রীটি বল্লে—"আর ত কোন কারণই জানা যায়নি! আবদুল ছুঁড়িটাকে বড্ড ভালবাস্ত..."

সুধীর নীরবে গিয়ে তার চেয়ারে বসে' পড়্‌ল। আব্‌দুল সম্বন্ধেই আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে একে একে মিস্ত্রীরা তাকে সেলাম করে' চলে' গেল। অন্ধকার হয়ে এসেছিল, তবু তার ঘরের বাতি জ্বালাতে ইচ্ছা হল না। করোগেটের টীনে ছাওয়া প্রকাণ্ড কার্‌খানা ঘরটার স্পষ্ট অন্ধকারে যন্ত্র ও কলকব্জাগুলো যেন হিংস্র

শ্বাপদদের মত নিঃশব্দ ব্যগ্রতায় ওৎ পেতে আছে মনে হচ্ছিল।

এবার আর সুধীরের নিজেকে বুঝ্‌তে কিছু বাকী ছিল না। মূর্খ সে, তাই সেদিন উৎপলের চারুকে ভালবাসার কথায় হেসেছিল, ঠাট্টা করেছিল। আজ তারই সাম্‌নে দিয়ে সেই উৎপল বিজয়ীর মত তার একান্ত আপনার তার চিরকালের অনুগত চারুকে তার অধিকার থেকে কেড়ে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে, আর সে তার ভুয়ো জড় যন্ত্রের তপস্যায় ভুলে একটা অঙ্গুলিও তোলেনি বাধা দিতে! শুধু এই কথা ভেবে সে আশ্চর্য্য হচ্ছিল যে, চারু তার জীবনের যে এত বড় সম্পদ এই সামান্য কথাটা এতদিন সে বোঝেনি কেন? উৎপল বাইরে থেকে এ রকম আঘাত না দিলে সে হয়ত নিজের সহজ অধিকারের নিশ্চিন্ততায় চারুর প্রতি তার এই গোপন আকর্ষণের গভীরতা কোন দিনই আবিষ্কার করতে পার্‌ত না। তার চোখের সাম্‌নে চারুর সেই চিরকালের নিবেদিত, একান্ত আত্মসমর্পণের মূর্ত্তিখানি ভেসে উঠ্‌তেই, তাকে আরেকটু হ'লেই হারাতে যাচ্ছিল ভেবে সে শিউরে উঠ্‌ল। তার নিজের অঙ্গের মত চারুর ওপর তার এমনি সহজ অধিকারবোধ ছিল যে বাইরে থেকে টান না পড়া পর্য্যন্ত সে চারুর অভাবের

বেদনা কল্পনা করতে পারেনি। সুধীর সারাজীবন যা চেয়েছে, প্রবলভাবে চেয়েছে, সে চাওয়ার ভেতরে কোন দ্বিধা কোন দুর্ব্বলতা কোন ফাঁকি কখনো থাকেনি। আজ সমস্ত অন্তর দিয়ে সে তেম্‌নি অনুভব করছিল, তার দুর্নিবার প্রেম হাঁক্‌ছে—চারু তার, চারুকে তার চাই-ই।

এরি সঙ্গে তার উৎপলের ওপর রাগ হচ্ছিল। কোন্ অধিকারে দু'দিনের উৎপল তার চারুলেখাকে ঠকিয়ে নিতে আসে? কি মূল্য আছে তার ওই ক'টা শব্দসার কবিতার আর তার মেয়েলি চেহারার? বোকা চারু কি ওই ফাঁকা আওয়াজেই মুগ্ধ হয়ে গেছে? সুধীর আর স্থির থাক্‌তে পার্‌ছিল না; দরোয়ানকে দরজা বন্ধ করতে বল্‌তেই কিন্তু তার চিঠির কথা মনে পড়ে' গেল। তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বেলে পড়্‌লে, একটা নতুন বিলিতি কোম্পানী লিখেছে—

"আমরা—তে নতুন কাগজের কার্‌খানা খুল্‌ছি, অন্যান্য কাষ্ঠজাত জিনিষেরও কারখানা তার সাথে থাক্‌বে। আমরা আপনার কাগজের কারখানা সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি পড়ে' বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। আমাদের নতুন কাজ আরম্ভ হয়েছে, সবে একটা পাহাড়ের ঝর্ণা থেকে তড়িৎ-শক্তি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ সময় একজন উপযুক্ত

অভিজ্ঞ লোকের বিশেষ দরকার থাকায় Mr Jameson এর কাছে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আপনার নাম করেন। আমাদের বড় তাড়াতাড়ি, আপনি যদি আমাদের Second Engineer-এর পদ গ্রহণ করেন তবে বিশেষ বাধিত হব। Mr. Powell এখন Chief Engineer, কিন্তু তাঁর শরীর এ-দেশের জল-হাওয়া সহ্য করতে পারছে না। আশা করি আপনি আমাদের বিমুখ করবেন না। মাইনে সম্বন্ধে আলোচনা চিঠি পেলে হবে। উত্তরটা তাড়াতাড়ি দেবেন, আমাদের সময় বড় দরকারী।"

বিরক্ত হয়ে লম্বা চিঠিটার উত্তরে "কাজ নিতে পারব না, ক্ষমা করবেন।" লিখে সুধীর, এতক্ষণে হাওয়া খেয়ে উৎপল বাড়ী ফিরেছে ভেবে উৎপলের বাড়ীর দিকে রওনা হল। আজ উৎপলকে সে ভাল করে'ই জানিয়ে দেবে চারুকে তার ভালবাসার কোন অধিকার নেই।

উৎপলের মেজদা হাঁকলেন,—"তা হ'লে টু ক্লাব্স্ রইল।"

বড়দা হাঁক্‌লেন—"টু রয়্যাল্স্।"

সেজদা হাঁক্‌লেন—"থ্রি হার্টস্"

সুধীর দরজায় মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"উৎপল আছে?"

সুধীরের দিকে চেয়ে মুখভঙ্গী করে ন'দা বল্লেন— "এই যে, থ্রি নো ট্রম্পস্।"

বড়দা বল্লেন—"একি, সুধীর যে!"

ন'দা হেঁকে বল্লেন—"ওই দেখ বড়দা, মেজদা তোমার সব তাস দেখে নিলে।"

ওদিক থেকে মেজদা ন'দার ঘাড়টা ধরে' বল্লেন— "তবে রে পাজী, তুই যে মেজদার তাস এই ফাঁকে দেখে নিলি।"

মেজদা বল্লেন—"দেখেছে ত, তবে এই যাঃ," বলে' সব তাস সাম্‌নে খুলে দিলেন।

সেজদা চেঁচিয়ে বল্লেন—"কি করলে মেজদা, এবার যে আমাদের রবার্ হত।"

ন'দা বল্লেন—"হ্যাঁ, ডন্‌লপ্ টায়ার্ হত, ফুটবল ব্লাডার হত।"

বড়দা বল্লেন—"তোরা থাম্ দেখি, এস সুধীর, বহুদিন তোমার রাসভবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর শুনিনি, একহাত ব্রে খেলা যাক্!"

"আচ্ছা, বড়দা, এ-পর্য্যন্ত যতদিন ব্রে খেলেছি, কোনদিন ও-মর্য্যাদা তুমি কাউকে প্রাণ ধরে' ছেড়ে দিয়েছ, বল ত ঠিক করে'।" বলে ন'দা হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

সুধীর বল্লে—"না, এখন আমার সময় নেই, উৎপল এসেছে ?"

ন'দা বল্লেন—"সে কি আর আছে ভাই, তাকে কি আর তোমরা রেখেছ? খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে—"

বড়দা এক ধমক দিয়ে বল্লেন—"থাম্ দেখি ফাজিল, না ভাই, উৎপল ত নেই।"

ন'দা বল্লেন—"তুমি আমায় ধমক দিলে যখন, তখন শোন। সেদিন অর্দ্ধেক রাতে দেখি উৎপল চিৎ হয়ে ছাতে পড়ে' আছে আকাশের দিকে চেয়ে। আমি বল্লুম —'তুই ত' কবি ছিলি জান্‌তুম, আবার জ্যোতির্ব্বিদ কবে থেকে হলি?' তার উত্তর হল—'সত্যি ন'দা, রাত্রির এই রহস্যলোকের দিকে চেয়ে যে কোনদিন সারারাত জেগে কাটাল না, সে অতি দুর্ভাগ্য।' আমি বল্লুম—'আমি ত জানি যে রাত জেগে কাটায় সেই দুর্ভাগ্য, এবং ডাক্তারি শাস্ত্রেও এ রোগকে বলে Insomnia, এবং তার রীতিমত চিকিৎসা দরকার।' তারপর বিস্তর সাধ্যসাধনা করেও তাকে 'রাত্রির রহস্যলোকের' ধ্যান থেকে বিচলিত করতে পারলুম না। প্রেমে পড়ে'ই না অমন চিৎপাত অবস্থা আজ ওর! দোহাই সুধীর, তোমার দু' একটা ইলেক্‌ট্রিক্

'শক্' দিয়ে তোমার বন্ধুটিকে বাঁচাও, যুথভ্রষ্ট ভাইটিকে আমাদের ফিরিয়ে দাও।"

"আচ্ছা, তা হ'লে আমি আসি," বলে' সুধীর বেরিয়ে গেল।

উৎপল এতক্ষণ চারুদের বাড়ীতে স্ফূর্ত্তি করছে এই চিন্তাতেই তার শিরায় শিরায় আগুনের হল্‌কা ছুটছিল। অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক উৎপল!

অতি মৃদু হাল্‌কা ভাবে অর্‌গ্যানের ওপর চারু আঙুল চালিয়ে যাচ্ছিল, এবং সমস্ত ঘরটি যেন একটি অতি সঙ্গোপনে কানে-কানে-বলা সুরের ইসারায় ভরে' ছিল। এ যেন পাখীর পাখা থেকে পালক খসে' যাবার, অন্ধকারে রজনীগন্ধার পাপ্‌ড়ি মেলার, রিক্ত শাখায় নতুন পাতা জাগ্‌বার নিঃশব্দ অতি কোমল সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা! উৎপল ঘরের অন্য পাশের একটি সোফায় চোখ বুজে হেলান দিয়ে ছিল। সুধীর চৌকাটের উপর নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল, ঘরটার চারধারে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। একসঙ্গে সুধীরের মনে সম্পূর্ণ বিপরীত দু'টি ভাবের ধারা বইছিল। তার মনে হচ্ছিল সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যজগতের এই অতুলনীয়া চারুকে সে ত' কোনদিন জানেনি, কোনদিন চেনে নি, —হতভাগ্য সে! তার হিংসা হচ্ছিল, ক্রোধ হচ্ছিল এই

ভেবে যে, এই চারুলেখাকে উৎপলই প্রথম আবিষ্কার করেছে। চারুর এই পুষ্পপেলব চম্পক-অঙ্গুলিগুলি একটু ছোঁবার জন্য এত লোভ কোথায় তার অন্তরে এতদিন সুপ্ত ছিল! এরই সঙ্গে তার রাগ হচ্ছিল চারুর ওপর, কিন্তু বুকের ভেতর সে ক্রোধ যেন হাহাকারের মত শোনাচ্ছিল। একবার মনে হ'ল চীৎকার করে' সঙ্গীত থামিয়ে চারুকে সে বলে—"নির্লজ্জ চারু, এ কি হচ্ছে?" কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে দমন করে' সে দরজা দুটো সবলে ধরে' দাঁড়িয়ে রইল।

চারু বাজ্‌না থামাতেই উৎপল উঠে বল্লে—"আচ্ছা, এইবার তা হ'লে আসি, তোমায় একটু বিরক্ত কর্‌লুম, কিছু মনে করো না।"

চারু ফিরে কি একটা কথা বল্‌তে গিয়ে থেমে অস্ফুট চীৎকার করে' উঠ্‌ল—"একি, অধীরদা!" ঘরের অনতি-স্পষ্ট আলোতে তার কান ও চোখ্‌ মুখ হঠাৎ রাঙা হয়ে যাওয়াটা কেউ লক্ষ্য কর্‌লে না।

উৎপলও বিস্মিত হয়ে দরজার দিকে চেয়েছিল। সুধীরের অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ দেখে কিন্তু কারুর মুখ দিয়েই কোন কথা সর্‌ল না। সুধীর উৎপলকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে' চারুকে বল্লে—"তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে চারু, ভেতরে চল।"

উৎপল বিস্মিত লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়ে "চল্লুম আমি" বলে' বেরিয়ে গেল। উৎপলকে এমন করে' যেতে দেওয়ার অশোভনতা অনুভব করতে পার্‌লেও চারুলেখা কিছু বল্‌তে পার্‌লে না। তখন তার হৃদয়ের স্পন্দন যদি কেউ অনু ভব কর্‌তে পার্‌ত!

চারু উঠে দাঁড়িয়েছিল। কি কথা তার নিষ্ঠুর অধীরদা এতদিন বাদে অকস্মাৎ আজ বল্‌তে এসেছে ভাব্‌তে না পার্‌লেও কি এক অপূর্ব্ব প্রতীক্ষায় তার সমস্ত দেহ কাঁপছিল। একটা হাত দিয়ে সে অর্‌গ্যানের একটা কোণ ভাল ক'রে ধর্‌ল।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে সুধীর ক্রুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বল্লে—"এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয় চারু। নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে।"

চারুর পা দুটো অবশ হয়ে এল, সে চেয়ারে বসে' পড়্‌ল। এক মুহূর্ত্তে তার সমস্ত স্বপ্ন চুরমার করে' ওই কর্কশ অপ্রত্যাশিত কথাগুলো দুঃসহ অপমান হয়ে তার আত্মমর্য্যাদাকে আহত ও বিদ্রোহী করে' তুললে।

নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে রূঢ় স্বরে সে বল্লে—"আর তোমাকেও বলি, সহেরও একটা সীমা আছে,

অভদ্রতারও একটা—" সে আর বল্‌তে পার্‌লে না, কান্নায় রাগে অভিমানে তার ঠোঁট্‌ কাঁপ্‌ছিল।

সুধীর চারুর কাছ থেকে এমন প্রতিঘাত কল্পনাও করতে পারেনি। সে ক্ষিপ্ত হয়ে বল্লে—"ঠিক বলেছ, সহ্যেরও একটা সীমা আছে। কিন্তু তোমার উৎপলের সঙ্গে আচরণ সহ্যের সীমাও ছাড়িয়ে গেছে, তাই বল্‌তেই এসেছি।"

"তার জন্যে তোমার এতটা কষ্ট করবার কোন দরকার ছিল না অধীরদা। এই কথাটুকু তুমি ভুলে যাচ্ছ ব'লেই তোমায় মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আমাকে শাসন করবার অধিকারটা বোধ হয় তোমার হাতে নেই। ঢের হয়েছে, আর অনধিকার চর্চ্চা করে' নিজের অপমান নিজে ডেকে এনো না।"

কঠিন ব্যঙ্গের সুরে বলা কথাগুলি সুধীরের সর্ব্বাঙ্গে বহ্নিদাহ জ্বালিয়ে তুল্‌লে। সে উন্মত্ত হয়ে বল্লে—"তোমার এত উন্নতি হয়েছে চারু এই ক'দিনে! এটা জান্‌লে অবশ্যই তোমাকে শাসন করতে এসে নিজের অপমান নিজে ডেকে আন্‌তুম না। শুধু এইটুকু জানালে বাধিত হ'ব এ সব কি উৎপলের শিক্ষার ফল?"

চারু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল্লে—"কোন কথাই তোমায় জানাতে আমি বাধ্য নই। আর এটা ঠিক জেনো যে

উৎপলের শিক্ষা আর মনুষ্যত্বের এক কণা পেলে তুমি ধন্য হয়ে যেতে!···হয়েছে ত, আর বিরক্ত করোনা, যাও।"

এবার সুধীরের কান্নায় গলা রুদ্ধ হয়ে আস্‌ছিল। সেদিনকার সেই নম্র অক্লান্ত সেবারতা চারু কি এই! তার মনে এ ধারণা ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্ছিল যে সে চারুকে এইবার একেবারে হারিয়েছে। এই নিস্ফল কথা-কাটাকাটিতে সে হারানোর বেদনা দ্বিগুন অসহ্য হয়ে উঠ্‌লেও সে বেদনার ও ক্রোধের আতিশয্যেই বোধ হয় নিরস্ত হ'তে পার্‌ছিল না কিছুতেই। তার ছাইবরণ মুখের দিকে চেয়ে চারু স্তম্ভিত হয়ে গেল, তার হৃদয়টা কে যেন তীক্ষ্ন ছুরি দিয়ে নির্ম্মমভাবে ক্ষতবিক্ষত করে' দিচ্ছিল। কিন্তু অসহায় অন্ধ মানুষ যে ভাগ্যের নির্ব্বোধ ক্রীড়নক!

সুধীর বল্লে—"হ্যাঁ যাচ্ছি, তোমার বিরক্তি উৎপাদন করছি জেনেও তোমার বাড়ীতে থাক্‌ব, উৎপলের তুলনায় যত হেয়ই হই এতটা অমানুষ আমি কখনই নই। কিন্তু তোমাকে একটা কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই চারু, যে কিছু দিন আগেই বারবার তিরস্কৃত হয়েও যেচে ক্ষমা ভিক্ষা করতে যেতে; বিরক্তি ত দূরের কথা, লজ্জা পর্য্যন্ত তোমার হয়নি কোন দিন। তখনও আমার মধ্যে

উৎপলের মনুষ্যত্বের এককণা ছিল না, তবে তখন উৎপলের সঙ্গে তোমার প্রেমাভিনয়ের সুযোগ ছিল না বটে।"

কিন্তু আঘাতের ওপর দ্বিগুণ আঘাত দিয়ে চারু চাপা কঠোর কণ্ঠে বল্লে—"দোহাই অধীরদা, ভেতরে মা বাবা আছেন, এখানে মিছিমিছি চীৎকার করে' একটা কেলেঙ্কারি করোনা। এখনো বাবা মা'র তোমার ওপর যেটুকু ভাল ধারণা আছে, সেটুকু আর খুইও না। যাও।"

কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে সুধীর এই মর্ম্মান্তিক আঘাতের উত্তরে শুধু বল্‌তে পারলে—"তোমার ওপর আমার দাবী আছে, সেই বিশ্বাসেই তোমার কাছে এসেছিলাম চারু। আচ্ছা চল্লুম, আর তোমায় জীবনে বিরক্ত করব না।" তারপর সে বেরিয়ে চলে' গেল। তার শেষ কথাগুলোর করুণ মর্ম্মভেদী ক্রন্দন শুধু ঘরের ভেতর চারুর বুকে বারবার হাহাকার তুলতে লাগ্‌ল।

বাড়ী গিয়ে সুধীর আগেকার চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে তৎক্ষণাৎ লিখ্‌লে—"আপনাদের কাজ সানন্দে গ্রহণ করলুম, যতশীঘ্র হয় আমি কার্য্যভার গ্রহণ করতে রাজী জানবেন।"

আর এখানে একটি নিঃসঙ্গ মেয়ে অন্ধকার ঘরের

মেঝেয় লুটিয়ে অন্তরের অশান্ত হাহাকার কোন মতে নিবারণ করতে না পেরে ভাব্‌ছিল—দাবী আছে তা কি তুমি জান্‌তে না নিষ্ঠুর? আর এতদিন বাদে যদি দাবী থাকার বিশ্বাস স্বীকারই করলে, তবে কেন সমস্ত দাবী অমন করে' ভুলে শুধু আঘাতটুকু নিয়ে ফিরে গেলে—কেন—কেন?—চিরকালের মত শুধু জোর করে' কেড়ে নিলে না কেন?

উনিশ

অর্দ্ধেক রাতে মা ঘুম থেকে জেগে উঠ্‌লেন হঠাৎ। বারান্দায় কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। 'সুধীর' বলে' ডাক দিতে বারান্দা থেকে উত্তর এল-- "কি মা ?"

মা আশ্চর্য্য হয়ে বাইরে এসে বল্লেন—"ঘুম হচ্ছে না বাবা ?"

সুধীর পাইচারি থামিয়ে বল্লে—"ঘুমোতে পারছি না মা।"

স্তব্ধ জনহীন পথে নিশ্চল গ্যাস্‌গুলো ঘুমন্ত শহরের ওপর পাহারা দিচ্ছিল। মা ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— "কেন বাবা, অসুখ করেছে কিছু ?"

সুধীর মা'র কাছে এসে বল্লে—"আমার কখনো অসুখ করেছে মা ?—-এম্‌নি ঘুম আস্‌ছে না।" তারপর আরেক-বার পায়চারি করে' থেমে বল্লে—"মাসীমাকে একটা চিঠি দিতে হবে মা, কালই তাঁকে জগাকে সঙ্গে করে' আস্‌তে লিখে দাও।"

"তা লিখে দেব, কিন্তু সে কথা হঠাৎ এখন মনে হ'ল কেন ?"

"বাঃ, তুমি কি একলা এখানে থাকবে নাকি ?"

মা বিস্মিত হয়ে বল্লেন—"পাগ্‌লা কোথাকার, তুই থাকতে আমি আবার এক্‌লা থাকব কেন ?"

"আমি যে কাল পরশুই চলে' যাচ্ছি মা।—খুব ভাল চাক্‌রী পেয়েছি একটা।"

মা আরো বিস্মিত হয়ে বল্লেন—"কি হয়েছে তোর, যা তা বকছিস্ কেন বল্ দেখি ?"

"না মা, সত্যি আমি যাচ্ছি।"—তার পর একটু শুক্‌নো হেসে বল্লে—"আমাদের ত আর স্বপ্ন আর মরীচিকা নিয়ে বসে' বসে' সময় নষ্ট করলে চলে না মা, পৃথিবীতে আমাদের কাজ আছে।" পায়চারি করতে করতে সুধীর বল্‌তে লাগ্‌ল—"অকর্ম্মণ্য যারা, তারা প্রজাপতির মত জীবনের মধুটুকু খেয়ে সুখের স্বপ্নে দিন কাটাক্, আমাদের ত দুঃস্বপ্ন কেটে গেলেও কাঁদবার অবসর নেই মা! আমাদের সময়ের অনেক দাম, পৃথিবীতে এখনো ঢের কাজ আছে। কোথায় কাঁটা ফুট্‌ল তাই নিয়ে বসে' হা হুতাশ কর্‌লে ত চল্‌বে না।"

এ সব অসংলগ্ন কথার কোন অর্থ খুঁজে না পেয়ে মা

বল্লেন—"আজ তোর কি হয়েছে বল্ ত? এই সেদিন এত খেটে কারখানা করলি, আবার আজ হঠাৎ বল্ছিস্ কাল পরশুই কোথায় চাক্‌রী নিয়ে যাবি—এর মানে কি?"

সুধীর রেগে উঠে বল্লে—"মানে ছাই, আমার মাথা আর মুণ্ডু! বড় কাজের সুবিধে পেলেও যাবনা ত' এখানে বসে' কবিতা লিখ্‌তে আর গান শুন্‌তে হবে নাকি? আমি যাচ্ছি, শুধু এইটুকু শুনে রাখ।" সুধীর আরো দ্রুত পায়চারি আরম্ভ কর্‌লে।

কিন্তু খানিকবাদেই অনুতপ্ত হয়ে মা'র পায়ের কাছে বসে' পড়ে' বল্লে—"লক্ষ্মী মা, রাগ করোনা, আমার না গেলেই নয়, তাই যাচ্চি। বল, রাগ করোনি, বল মা, তুমি মত দিয়েছ, তা না হলে পা ছাড়্‌ব না।"

মা বসে' ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বল্লেন —"আমি মত দেব না কেন বাবা? তোমার যাতে ভাল হয় তাই করবে, কিন্তু কি হয়েছে বল ত বাবা।"

সুধীর হাস্‌তে চেষ্টা করে' বল্লে—"বাঃ, তুমি ভাব্‌ছ আমি কোনো দুঃখে যাচ্ছি? সত্যি মা, আমার কোনো দুঃখ নেই। ভুল করে' ঠকে' দুঃখ করব এমন বোকা তুমি আমায় ভেবেছ? আমি কিছু কেয়ারই করি না, অত

মোমের পুতুল আমরা নই। তুমি দেখোনা মা, এবার এমন এক মনে কাজ করব, এমন সব কাজ করব যা কেউ কখনো ভাবেনি। সকলকে দেখিয়ে দেব, আমার কিছুই আসে যায় না। তাদের অভাবে আমার লাভ বই ক্ষতি নেই।"

স্থধীর চুপ করল। দূরে কোন্ বাড়ীতে একটি শিশু জেগে উঠে কাঁদছিল। নিস্তব্ধ অন্ধকার আকাশের তলায় সে কান্না অদ্ভুত শোনাচ্ছিল, নিদ্রিত শহরের পথে পথে সে কান্নার প্রতিধ্বনি উঠছিল।

মা আজ যথার্থ ই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন স্থধীরের জন্য। কিন্তু কি গভীর ব্যথা যে স্থধীরের অন্তরকে এমন করে' পীড়িত করছিল বুঝতে না পেরে তিনি বিমর্ষ হয়ে বল্লেন —"আমি কি করে' তোকে ছেড়ে একলা থাক্‌ব? তুই আমায়ও নিয়ে চল্‌না তোর সঙ্গে।"

"সে এখন হয় না মা।" তার পর খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে স্থধীর বল্লে—"জানো মা, যন্ত্রের জগতে যুগান্তর আন্‌বে এই যার পণ, মানুষের হাতে সমস্ত জড় শক্তিকে বন্দী করে' দান করে' যাবে এই যার সাধনা, তার কি ছোটখাট দুঃখ ব্যথা নিয়ে দুর্ব্বলের মত কান্নাকাটি করা চলে? তার ত ওসব তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে মাথা

ঘামাতে যাওয়াই বোকামি। আর তাতে যদি ঘা সে খায়, সে তার ভালর জন্যই—শুনছ ত মা?"

"শুনছি বাবা।"

"আমি এইটুকু বুঝি মা, যবনিকার অন্তরালে বসে, যিনি মানুষের পুতুল-নাচ খেলাচ্ছেন, তিনি যেই হোন তাঁর ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই। যাকে যেমন করে' চালাবেন, সে-পথ থেকে তার তিলমাত্র বিচ্যুতি তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। আমার হাতে হাতুড়ি দিয়েছিলেন, আমার মালা গাঁথবার চেষ্টা তিনি সহ্য করবেন কেন? আর আমিও তা চাই না মা, তাঁর দেওয়া এই হাতুড়িকেই আমি যেন সার্থক করতে পারি আমার জীবনের সমস্ত দিয়ে। এই ঠিক না মা?"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাবা।"

'না মা, আমি জানি তুমি সব জান, তুমি অনেক বেশী বোঝ।"

কিছুক্ষণ পরে সুধীর বল্লে—"আজ আর একবার ছেলেবেলার মত তোমার কোলে মাথা রেখে শুতে ইচ্ছে হচ্ছে মা।"

মা'র কোলে মাথা রেখে শুয়ে সে বল্লে—"দুঃখ কিসের মা? দুর্ব্বল কাপুরুষ ঘা খেয়ে কাঁদবে, কাঁদুক! আমার

তুমি আছ মা, আর থাক্ এই হাতুড়ি, আমি কিছু কেয়ার করি না।"

মা কিন্তু অনুভব করলেন তপ্ত জলের ফোঁটায় তাঁর কোল সিক্ত হয়ে যাচ্ছে।

তখন রাত্রির নিথর নিস্তব্ধতায় নিকটের কোন পথে একটা গরুর গাড়ী প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অশেষ বিরোধের শব্দে নালিশ জানাতে জানাতে চলেছে।

কুড়ি

টেবিলের ওপর পাশাপাশি দু'খানি বই—Indian Engineering আর উৎপলের জাপানী বাঁধাই খাতাখানি। অন্নদাবাবু সুধীরের প্রশংসা বেরিয়েছে শুনে খুঁজে খুঁজে এই পত্রিকাখানি কিনে এনেছিলেন। একটা শোফায় চারুলেখা বসে' ছিল। পত্রিকাটা সে একবার হাতে টেনে নিয়ে পড়তে চাইল, দুর্ব্বোধ ভাষার অর্থ তার মগজে ঢুকছিল না, অক্ষরগুলি সমস্ত যেন ষড়্‌যন্ত্র করে' তার চোখের সুমুখে ধাঁধাঁ হয়ে উঠ্‌ছে! রাগ করে' বইটাকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, বইটা টেবিলের নীচে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়্‌ল! চারু সেদিকে দৃক্‌পাত না করে' সাদরে উৎপলের খাতাখানি টেনে নিল কোলে। কি সুন্দর খাতাখানি, কি পরিষ্কার সুস্ফুট হাতের লেখাগুলি! বিশ্বশিল্পী রাত্রির মৌন আকাশে যেমন নক্ষত্রের অক্ষরে রহস্যের জাল বোনেন অবিরত, তেমনি এই মাটির মোহন কবিটি তার শাদা

খাতার বুকে তুলির টানে এ কি নব নব অর্থভরা কথার জাল বয়ন করে গেছে! এই অক্ষরগুলি যেন প্রদীপ জ্বেলে ধরেছে কোন্ অন্ধকার রহস্যলোকের দুর্গম পথের নিশানা বলে' দিতে। এ অক্ষরগুলি যেন কোন্ প্রস্ফুটিত আলোকশতদলের পাপ্‌ড়ির গায়ে গায়ে রঙের লেপন। চারু বিমুগ্ধ হয়ে এ অক্ষরগুলি দেখতে লাগ্‌ল। খাতাটা খুল্‌তেই চোখে পড়্‌ল—'বাসকশয্যা' কবিতাটি। চারু অস্ফুট কণ্ঠে আবার কবিতাটি পড়্‌তে লাগ্‌ল।—

"প্রিয়া নির্জ্জন নিকেতনে বসন্তমঞ্জরী ও অশোক চম্পকের ফুলশয্যা রচনা করে' রেখেছে, রচনা করেছে বকুল-শেফালির মালা, মৃণ্ময় প্রদীপ একটি জ্বালিয়ে রেখেছে নিরালায় দ্বারের কিনারায়, তিমিরান্ধ বন্ধুর পথের সম্মুখে, ধূপাধারে গন্ধধূপের আলোড়ন উঠেছে, ম্লানকান্তি প্রতীক্ষামগ্না বিরহিনীর চোখে নিদ্রা নেই, তার অলকগুচ্ছে রাতের সুশীতল শিশির বাতাস অন্ধকারের সুবাস মাখিয়ে দিচ্ছে, তার দয়িত হৃদয়বল্লভ আস্‌ছেন! রাত্রির ক্লান্ত বিনিদ্র প্রহর শেষ হয়ে এল, নীড়ে পাখীর পাখার ঝাপট স্তব্ধতাকে হান্‌ছে, তারার চোখের আলো প্রতীক্ষার ব্যথায় স্তিমিত হয়ে এসেছে আকাশে, দুঃসহ বিরহ বেদনা সহ করতে না পেরে বিরহিণী ব্যর্থ বাসক-

শয্যা ত্যাগ করে' বেরিয়ে পড়্‌ল অন্ধকারে ধূলি-কণ্টকিত পথে পথে।...একি অপরূপ অনন্ত বাসক-শয্যা রচনা করে' রেখেছে বিশ্বদরদী রাজেন্দ্র, নিথর রাত্রির অনাদি আকাশের নীচে এই শ্যামাঙ্কিত ধরিত্রীর বুকের আসনে! এ কি সুষমা! তার প্রিয় তাকে এই শয্যায় আহ্বান করেছেন। ব্যথাহতা বিরহিণী ধরিত্রীর ম্লান বাসক-শয্যায় লুটিয়ে পড়ে' কাঁদতে লাগ্‌ল—এস হৃদয়েশ, এস নিষ্ঠুর, এস বিরাগী!"

পড়্‌তে পড়্‌তে চারুর দু' চোখ চোখের জলে ছল্‌ছল্ করে' উঠ্‌ল। সে আস্তে-আস্তে খাতাটিকে বুকের ওপর নিবিড় স্নেহে চেপে ধর্‌ল! দুঃখিনী ঘরছাড়া নারীর বুকের স্পন্দনটি যেন খাতার বুকে বাজ্‌ছে, এমন করে' নারীর বুকের বিরহ ব্যথাকে ভাষা দিতে পারে এই খাতা! চারুলেখা খাতাটিকে আরো একটু জোরে চেপে ধর্‌তেই তার সমস্ত দেহ অসহনীয় লজ্জার আনন্দে কচি কিশলয়ের মত কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। তার মনে পড়ে' গেল সকালের ডাকে তার দিদির লেপাফার চিঠিখানি। তাতে এক জায়গায় লেখা ছিল—

"তোর বিষয়ে আমি ভারী নিশ্চিন্ত আছি, চারু। উৎপলের গলায় মালা দিবি বোন, এ ভাব্‌লে আমার

মনে খুসী আর ধরে না। বাবা মাও উৎপলের এই সাধকের মত গভীর প্রেমকে উপলব্ধি করতে পেয়েছেন; আমি জানি তাঁরা কোন দিন তার প্রার্থনাকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। আর আমি এও জানি আমার ছোট লক্ষ্মী দুষ্টু বোনটি কবির কল্পনাকে একটি সুন্দর মূর্ত্তি দিয়ে সার্থক করতে ভারী অভিলাষী! নয় কি দুষ্টু মেয়ে? আমার কাছে আর কোন কথা গোপন করে' লাভ নেই, সব খুলে লিখিস্, আর উৎপলকে বলিস্, আমি তাকে আশীর্ব্বাদ পাঠাচ্ছি।"

মনে পড়্তে চারুর বুকের সমস্ত রক্ত চন্চন্ করে' উঠ্ল। সে আস্তে আস্তে কবিতার খাতাখানি টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখ্লে।

সুনয়নী দেবী ঘরে ঢুকে বল্লেন—"তোর অধীরদা যে আজ চলে' যাচ্ছে কোথায়, কোন্ হিমালয়ের পাহাড়ের ধারে কি কারখানার কাজ পেয়ে। চল্ বেলফুলের কাছে, একবার দেখা করে আসি।"

"অধীরদা চলে' যাচ্ছেন?" চারুর সর্ব্বাঙ্গে কে যেন চাবুকের ঘা মার্লে।—"একেবারে আজই?"

মেয়ের কথার ধরণে মা একটু সচকিত হয়ে বল্লেন—"হাঁ, কাজ পেয়েছে প্রকাণ্ড মাইনের, যাবে না? নে ওঠ্,

বেলফুল বলে' পাঠাল এই মাত্র। বেচারীর বড্ড কষ্ট হবে ছেলেটাকে ছেড়ে।"

চারু প্রাণপণে নিরুদ্ধ অশ্রুর বেগ সংযত কর্‌ছিল। অবরুদ্ধ বেদনার স্বরে সে চোখ নীচু করে' বল্লে—"না মা, আমি যাব না।"

"সেকি রে? চলে' যাবে, দেখা করে' আসি।"

"তুমি এক্‌লা যাও।"

"তুই যাবিনে?"

"না মা, আমি পার্‌ব না যেতে।" বলে' চেয়ার ছেড়ে উঠে অন্য ঘরে তাড়াতাড়ি চলে' গেল।

মা বিস্মিত হয়ে একটু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ডাক্‌লেন—"এ কি চারু?"

চারু ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে—"অধীরদা আপনিই হয়ত দেখা করতে আস্‌বেন, আমার না গেলেও চল্‌বে।"

সুনয়নী দেবী পাশের ঘরে গিয়ে দেখ্‌তে পেলেন চারু মেঝের ওপর পালঙের পায়ায় পিঠের ভর্ রেখে আঁচলে মুখ ঢেকে বসে' আছে। তিনি তার কাছে বসে' পড়ে' মৃদুস্বরে বল্লেন—"কি হয়েছে চারু? কাঁদ্‌ছিস্ যে?"

চারু আঁচলের আড়ালে বারে বারে ফুঁপে উঠ্‌ছিল, তার এই ব্যথার গোপন কাহিনীটি বল্‌বার তার ভাষা

ছিল না যেন! অধীরদা চলে' যাচ্ছেন! এত নির্ম্মম তাঁর প্রতিশোধ! নিরপরাধ চারুকে কি এম্নি ক'রেই ঘা দিতে হয় প্রতিদানে?

সুনয়নীর মনে একটি সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে উঠ্ছিল। হঠাৎ সদাপ্রফুল্ল মেয়েকে কয়েক দিন থেকে অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর ও উদাসীন থাকতে দেখে তিনি ও অন্নদাবাবু মনে মনে ভারী অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। সহসা আজ মেঘের নিবিড় গুমোট কেটে কান্নার শ্রাবণ নেমে আস্তেই তাঁর সন্দেহের একটা ঠিক কিনারা পেয়ে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্লেন। পরে সান্ত্বনার সুরে তিনি বল্লেন—"তাতে কি মা? বিদেশে সবাইরই যেতে হয় চাকরী পেলে। আবার দু'দিন বাদে ফিরে আসে। চল্ একবার দেখা করে' আস্‌বি।"

মা'র কথা শুনে চারুর সমস্ত অন্তর জ্বলে' গেল। সে তীব্র কণ্ঠে বল্লে—"তুমি কি ভাব্ছ মা? আমি যাব দেখা করে' আস্‌তে? যে বাড়ী বয়ে' অপমান করে' যায়, যার সামান্য একটু ভদ্রতাজ্ঞান নেই, তার বাড়ী আমি যাইনে।" চারু আবার আঁচলে মুখ ঢেকে কান্নায় ফুলে' উঠ্তে লাগ্‌ল।

সুনয়নী ঠিক কিছুই বুঝ্তে পারলেন না, তার পিঠে

হাত রেখে বল্লেন—"সুধীর তোকে অপমান করেছে? সে কি কথা? কবে?"

"যাও, কিছু বুঝ্‌বে না তুমি, আমি যাব না।" বলে' উঠে পালঙটার ওপর শুয়ে পড়্‌ল ঝড়ে ছিঁড়ে-পড়া শীর্ণ লতাটি যেমন ভুঁয়ের ওপর নেতিয়ে পড়ে।

মা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে একলাই চলে' গেলেন একান্ত উদ্বিগ্ন চিন্তাকুল মন নিয়ে।

তারপর এম্‌নি করেই অভিমান-আহত দুর্ব্বল অসহায়ের বুকে কান্নার বাদল নেমে আসে! চারু জীবনে কান্নার এই বহ্নি-জ্বালা কোনো দিন আর অনুভব করেনি। সে বল্‌ছিল—"ভগবান তোমার হাতে হাতুড়ী দিয়েছিলেন কি আমারই বুকে খালি আঘাত হান্‌তে, নিষ্ঠুর? এত শক্তিমান তুমি, কিন্তু তোমার ঐ বাহুতে কি এতটুকু শক্তি ধর্‌ল না যে আমাকে..."

চারু সমস্ত অন্তর দিয়ে যন্ত্রতপস্বীকে ডাকছিল, কিন্তু সে এলো না। তার বিশ্বাস ছিল এত দূর দেশে যাবার আগে একটিবার সে দেখা করে' যাবেই। তার হঠাৎ মনে পড়্‌ল কলেজে ভর্ত্তি হতে যাবার সময় সুধীর তাকে সঙ্গোপনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল—'আমাকে রোজ চিঠি লিখিস্‌ চারু, নইলে তোদের জন্য আমার ভারী মন

কেমন করবে।' চারুর চোখ জলে ভরে' উঠেছিল দেখে কান্নাভরা কণ্ঠে বলেছিল—'আমারো ভারী কষ্ট হচ্ছে চারু তোদের ছেড়ে যেতে। কিন্তু দেখিস্, পাশ করে' নিশ্চয়ই একটা মস্ত লোক হব। একটা প্রকাণ্ড কারখানা করব তখন কল্কাতাতেই, তখন আর তোতে-আমাতে ছাড়াছাড়ি হবে না।' তারপর সুধীর যখন চলে' যায়, চারু দুয়ার ধরে' পথের পানে চেয়ে রয়েছিল, আর যদ্দূর না গলিটা পূবে বেঁকে গেছে চোখের শেষে, ততদূর সুধীর গাড়ীর জান্লা দিয়ে দেখেছে আর দেখেছে। বিদায় বেলায় পরম রমণীয় অনন্তমধুর একটি ব্যথা আছে। সেটি সেদিন দুজনে কি অপার আনন্দে সম্ভোগ করেছিল!

কিন্তু দিনের আলো থিতিয়ে পড়ছে আকাশে, সুধীর এখনো একটিবার এলো না বিদায় জানাতে। চারু ভাব্ছিল, এ কি সেই সুধীর, সেই করুণায়-ভরা অশেষ স্নেহশীল তার অধীরদা! বাইরে বারান্দায় এসে দেখ্লে সুধীরের ঘরের সেই অবরুদ্ধ জান্লাটা তার পানে চেয়ে ভ্রুকুটি করছে। সে নিজেকে ভারী অপমানিত বোধ করছিল; হঠাৎ এই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃথা এতক্ষণ কাঁদবার জন্য নিজেকে তার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হল। সে ফের নিজের ঘরে এল। তখন অন্ধকার আকাশের কোণে

কোণে জমে উঠছে! মেঝের লুটানো Indian Engineeringটা তুলে টেবিলের ওপর উৎপলের খাতার ওপর রেখে দিলে। হাতের কাছে কোন কাজই পাচ্ছিল না সে কর্‌বার। চুল বাঁধতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না, চুলগুলি শুকোয় নি এমন জড়সড় ভাবে শুয়ে থাকায়। সে আস্তে জানলার সাম্‌নে এসে বস্‌ল। এখান থেকে সুধীরদের বাড়ীর কোন ঠাহর হয় না বলে'ই এখানে সে বসেছিল, দেখলে বাতি-ওয়ালা মই কাঁধে নিয়ে চলেছে। খানিকক্ষণ পর আবার সেখান থেকে উঠল, ঘরে বসে' থাক্‌তে তার মন টিক্‌ছিল না, কে যেন তাকে ডাক্‌ছে। সে চুলগুলি খোঁপা করে জড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে পথে বেরিয়ে পড়ল। সে নিজের অলক্ষিতে গলির মোড় পেরিয়ে একেবারে সুধীরদের বাড়ীর কাছে এসে পড়ল। দেখতে পেলে অন্ধকারে তার মা ও মাসীমা দুয়ারের পাশে বুকের ওপর বেদনাকুল স্নেহ-কোমল দৃষ্টি পথের বুকে প্রসারিত করে' দাঁড়িয়ে আছেন। তবে এইমাত্র যে মালবোঝাই গাড়ীটা চলে' গেল তাতেই কি সুধীরদা বসে' ছিলেন? তাকে দেখতে পায়নি ত অন্ধকারে? না, না, পায়নি; সে কি একটুও জানে, চারু আজ অন্ধকার পথের কিনারায় নিঃসম্বল ভিখারিণীর মত কাকুতি-ভরা চোখে চেয়ে রয়েছিল তারই একটি দৃষ্টির

সম্ভাষণ পাবার জন্য? ঈস্? অমনি একটু ঠাণ্ডায় ঘুরে যেতেই ত সে পথে এসেছে। ভারী বয়ে গেছে তার...

চারু নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; দেখ্‌তে পেলে দূর থেকে হাওয়ায় সিল্কের উড়্‌নি উড়োতে উড়োতে উৎপল আস্‌ছে। চারুর মন পাতার মতন ঝিরঝির ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। সে দেখ্‌তে পেলে উৎপলের রুক্ষ লম্বা চুলগুলি অন্ধকারের শিখার মতন বাতাসে কি সুন্দর কাঁপ্‌ছে, চলার ভঙ্গীতে সঙ্গীতের যেন একটি মদির মূর্চ্ছনা, চাদরের চারু সজ্জাকৌশলের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব শ্রী! চারু মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল! উৎপল কাছে এলে অন্ধকারে চারুকে দেখতে পেয়ে পরম আনন্দে একটু হাস্‌লে, চারু একটি সুমোহন লজ্জা দিয়ে সেই হাসিটিকে অভিনন্দন করলে।

উৎপল দেখ্‌লে চারুর মুখে ক্লান্ত একটি ব্যথার লাবণ্য মাখানো, দীর্ঘায়ত মদির নয়নে কোন্ আকাশের সুনীল স্বপ্নভরা, দুটি পুষ্পপেলব হাতে একটি সুশীতল সান্ত্বনা! আরো একটু এগিয়ে এসে উৎপল বল্লে,—“অন্ধকারে পথে একলা যে লেখা!”

চারুকে এমন সুরে কেউ ডাকেনি। তার সমস্ত দেহ সেতারের তারের মত বাজতে লাগল অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে। চারু

কার ওপর নির্ম্মম প্রতিশোধ নেবার আশায় মরীয়া হয়ে বলে ফেললে,—"তোমার জন্ম পথের পানে চেয়ে রয়েছিলাম, জান্‌তাম যে তুমি আজ আস্‌বেই।"

উৎপলের সমস্ত রক্ত ফুট্‌ছিল। সে চারুর শিথিল একখানি হাত নিজের মুঠির মধ্যে পরম আদরে টেনে নিয়ে আনন্দকম্প্র কণ্ঠে বল্লে—"চল, ঘরে যাই।"

একুশ

নিঃশব্দ সঞ্চারে যে আদিম নিবিড় অরণ্যে যুগ যুগ ধরে শুধু হিংস্র শ্বাপদ শীকারের অনুসন্ধানে ফিরেছে, যার অসংখ্য শাখা প্রশাখা ও বন্যলতার জটিলতার মাঝে অগণন জীবন কাহিনীর বিচিত্র অভিনয় হয়ে গেছে মানুষের অজ্ঞাতে, যার পতঙ্গ-গুঞ্জন-মুখর অন্ধকারের গোপনতায় কি বিপুল বিভীষিকা ও কি অসীম রহস্য কি অনন্ত জীবন-সমারোহ ও ভীষণ মৃত্যু-মহোৎসব—সেই অরণ্যেরই এতকালের দুর্গমতার সমস্ত সম্মান ও সম্ভ্রম পদদলিত করে' একহাজার কুলি জঙ্গল কেটে নতুন কারখানার পত্তন করতে লেগেছে।

সুধীরের মনে হয় রাত্রে এই ক'টি উচ্চকর্ম্মচারীদের তাঁবু আর কুলিদের পাতায়-ছাওয়া বস্তির চারিধারে ক্ষুব্ধ বিশাল অরণ্য এই ক'টা দুর্ব্বল মানুষের দুঃসহ দাম্ভিকতায় বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে হিংস্র ক্রুর দৃষ্টি হেনে ওৎ পেতে থাকে। দিনের বেলা সে উন্মাদের মতো কাজ করে, আর সমস্ত রাত্ত ভালো করে' ঘুমুতে পারে না। যত অদ্ভুত কথা তার

মনের মাঝে জট্ পাকাতে থাকে। রাত্রির অন্ধকারে অরণ্য হতে যখন কোনো মর্ম্মর ওঠে, তার মনে হয় অরণ্যের মাঝে পশু ও উদ্ভিদ্ জগতে যেন এক বিষম ষড়যন্ত্র চলেছে মানুষের বিরুদ্ধে। সত্যি এ সংগ্রাম। দুরাশাদাম্ভিক মানুষের সাথে চিরসহিষ্ণু প্রাচীন প্রবীণ অরণ্যের এ সংগ্রাম। এতদিন বাদে বোঝাপড়ার দিন এসেছে, মানুষের অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে অরণ্য আজ বেঁকে রুখে দাঁড়িয়েছে।

কুলিরা দলে দলে জ্বরে পড়্ছিল। অরণ্যের পচা পাতার জঞ্জাল থেকে বিষাক্ত বাষ্প উঠে বাতাস ভারাক্রান্ত করে' রেখেছে। যে ঝর্ণার গতি ফিরিয়ে তাকে লৌহবন্ধনে বেঁধে তার কাছ থেকে তড়িৎশক্তি আদায় করবার সঙ্কল্প কোম্পানীর ছিল, সে ঝর্ণাকে আয়ত্ত করা এক রকম অসম্ভব দেখা গেল। সুধীরের আস্বার দিন দুই পরেই বিদেশী জঙ্গলের জলহাওয়া সহ্য করতে না পেরে Chief Engineer, Mr Powell মারা গেলেন। সুধীরের হাতে সমস্ত ভার পড়ল। সে এতদিন যন্ত্রের স্বপ্নই দেখেছিল, যেখানে যন্ত্রদেবতার পূজা চলে সহস্রোপচারে সেখানকার অভিজ্ঞতা তার ছিল না। তার মনে ভয় হল হয়ত বাঙালীর মুখ সে রাখ্তে পার্বে না। তাই প্রাণপণে সে কাজে লাগ্ল। সমস্ত দিন অক্লান্ত কাজের মধ্যে সে নিজের মনকে এতটুকু

ছুটি দিত না, কিন্তু রাত্রে অত খাটুনির পরও সে নিজের তাঁবুতে বসে ভাল করে' ঘুমুতে পারত্না, অন্ধকার অরণ্যের গুমোট যেন তার বুকের' ওপর ভার হয়ে থাকে। অরণ্যের মাঝে যেমন, তার অন্তরেও তেম্নি কি যেন এক অন্তহীন অস্বস্তিতে অহরহ অস্থির বেদনা-গুঞ্জন উঠ্ছে।

সে নিজেকে বোঝাত, "এই কর্ম্মই তার সত্য, আর সব ফাঁকি, মিথ্যা, যন্ত্রতপস্যার বাধা।" কিন্তু তার মনের কোণের সুগভীর বেদনাটিকে সে কিছুতেই দূর করে' দিতে পারতনা, এ সব কথা নিজের কাছেই স্তোক-বাক্য বলে' মনে হত। নিজের ভেতর থেকেই কে তাকে বিদ্রূপ করে বল্‌ত, "জীবনে যা ঘট্‌ল তা ভাগ্যদেবতার আদেশ বলে' অত বিশ্বস্তভাবে মেনে নেবার আগে আর কিছু কর্‌বার ছিল না কি?" সে এই বিদ্রোহী বাণীকে দমন কর্‌বার জন্যে ভাব্‌ত, "কর্‌বার দরকার ত ছিলই না, আমার কি ক্ষতি হয়েছে?" কিন্তু অত সহজে মীমাংসা হত' না, বিদ্রোহী মন বল্‌ত, "অত কষ্ট করে' খাড়া করা কারখানাটা একদণ্ডে ছেড়ে দিয়ে এই বনবাসে আসাই কি এমন প্রয়োজন ছিল তবে!" সে মনে মনে এ অশান্তিকর দ্বন্দ্ব থেকে রেহাই পাবার জন্যে চাকর-বাকরকে

ধম্‌কে জাগিয়ে আলো জ্বালিয়ে হয়ত Electric Plant এর plan নিয়ে বস্‌ত এবং অনিচ্ছুক মনকে চাব্‌কে কার্য্যে নিয়োগ করে' রাত্রির তৃতীয় প্রহরে হয়ত শুতে যেত। কিন্তু এম্‌নি করে' জীবনের বাকী সমস্ত দিন নিজের সঙ্গে বিরোধ মেটাতেই যাবে ভাব্‌তে সে শিউরে উঠ্‌ত। একদিন যে যন্ত্র তপস্যা তার আনন্দের খেলা ছিল, আজ তা শুধু নীরস কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শাল, ওকার, পানি শাজ, সফেদ চাঁপ, বুক্‌ ও পিপ্‌লি গাছের জঙ্গলের মাঝে ছবির মতো ছোট ষ্টেশনটি। লাল কাঁকরের পরিষ্কার প্লাট্‌ফর্ম্মের ওপর সুধীর একটু অস্থির ভাবে পায়চারি করে' বেড়াচ্ছিল। নির্জ্জন ষ্টেশনে দূরে নীল কোর্ত্তাপরা দু-একটি ভুটিয়া কুলি ছাড়া আর কাউকে বাইরে দেখা যাচ্ছিল না। ষ্টেশনের রেলিঙের বাইরে একটা টম্‌টমে শাদা রঙের একটা টাট্টু ঘোড়া থেকে থেকে অস্থির ভাবে পা ঠুক্‌ছিল। টালী-ছাওয়া ঘর থেকে ষ্টেশনমাষ্টার বেরিয়ে এসে বল্লে, "আপনার কার্‌খানার slasher mill আর couch roll গুলোই ত শুধু আস্‌ছে দেখ্‌ছি, barking mill আর ground wood mill এর কোন খবর পেলুম না ত।"

সুধীর অধৈর্য্য হয়ে মাটীতে পদাঘাত করে' বল্লে,

"অথচ আমি একমাস আগে থেকে তাড়া দিচ্ছি। আমাদের কি রকম সময় নষ্ট হচ্ছে ওদিকে।"

ষ্টেশন মাষ্টার সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস কর্‌লেন, "আপনাদের ঝোরা বাঁধা শেষ হয়ে গেছে ?"

সুধীর বল্লে, "তার জন্যেই ত আর দেরী কর্‌তে পাচ্ছিনা ! কুলীরা বেকার বসে' আছে, এবারের বাজার' মন্দা, আর দেরী করলে কাল দিতে পার্‌ব না।"

ষ্টেশন-মাষ্টার বল্লেন, "দেখুন আমাদের কোন দোষ নেই, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।"

সুধীর এসে বল্লে, "না না আপনাদের দোষ কি !"

ষ্টেশন-মাষ্টার একটু ইতস্ততঃ করে' বল্লেন, "দেখুন আপনি যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা বলি। আপনাদের এই আশ্চর্য্য ঝোরা বেঁধে ইলেক্‌ট্রিসিটি তৈরী করবার কথা শুনে এত ইচ্ছে হয় দেখবার, যদি একদিন অনুমতি দেন, তা হলেই···"

সুধীর অবাক্ হয়ে বল্লে, "এর আবার অনুমতি কি দরকার ? আপনি গেলেই দেখ্‌তে পারেন ত !"

ষ্টেশন-মাষ্টার মাথা নেড়ে বল্লেন, "না না আমায় ঠাট্টা কর্‌বেন না। আমি কি জানিনা এ সব গোপন জিনিষ,

বিনা অনুমতিতে দেখ্‌তে গেলে গুলি করে' মারে? তবে আপনি যদি—"

সুধীর এবার হেসে ফেলে বল্লে, "কে আপনাকে ও সব কথা বলেচে, বলুন ত। আপনি নির্ভয়ে যাবেন, আর আমিই না হয় আপনাকে নিয়ে যাব' খন।"

অত্যন্ত খুসী হয়ে ষ্টেশনমাষ্টার বল্লেন, "তা হলে আর কথাই নেই। দেখুন আপনি বাঙালী হলেও এত বড় লোক হয়েছেন, কত দিন আপনাকে বল্‌ব-বল্‌ব ভেবেও বল্‌তে পারিনি ভয়ে।"

সুধীর বল্লে, "তা হলে ওই মালগুলো সম্বন্ধে একটু তদ্বির কর্‌বেন। আমি এক দিন এসে আপনাকে নিয়ে যাব'খন

ষ্টেশনমাষ্টার ইতস্ততঃ করে' বল্লেন, "কিছু যদি মনে না করেন ত আমার বাড়ীতে একটু চা খেয়ে গেলে বিশেষ বাধিত হব। ওই ষ্টেশনের কাছেই আমার কোয়ার্টার।"

সুধীর আপত্তি করবার কোন কারণ না পেয়ে রাজী হ'ল।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটিতে সুধীরকে বসিয়ে প্রৌঢ় ষ্টেশনমাষ্টার অনাবশ্যক উচ্চস্বরে ডাক্‌লেন—"সেবা! চায়ের জল চড়াও শীগ্‌গির, একজন ভদ্রলোক এসেছেন।"

এতবড় নামজাদা অতিথির উপস্থিতিতে প্রৌঢ় স্পষ্টই একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। ঘরখানিতে আস্‌বাবপত্র বেশী না থাক্‌লেও পরিচ্ছন্নতা ও রুচির ছাপ্‌ ছিল।

সুধীরের দৃষ্টি লক্ষ্য করে' প্রৌঢ় বল্লেন, "ও সব আমার মেয়ের হাতের আঁকা। দেখ্‌বেন Art Exhibitionএ কি রকম প্রশংসাপত্র পেয়েছিল?"

এমন অকস্মাৎ কারুর প্রশংসাপত্র দেখ্‌বার জন্যে আদৌ ইচ্ছুক না হলেও সুধীর ভদ্রতার খাতিরে 'না' বল্‌তে পার্‌লে না। কিন্তু ভদ্রলোক প্রশংসাপত্রের পর স্কুলের প্রাইজ এবং স্কুলের প্রাইজের পর সূচীকার্য্যের নমুনা যে রকম ভাবে দেখাতে আরম্ভ করলেন ও সেই সঙ্গে তাঁর অসাধারণ মেয়ের যে রকম পরিচয় দিতে সুরু কর্‌লেন তাতে সুধীর বেশ একটু শঙ্কিত কৌতূহল নিয়েই এই অসামান্য মেয়েটির আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌ল। ভদ্রলোকের কথায় জানা গেল যে সংসারে তাঁর এই মেয়েটি ছাড়া আর কেউ নেই, এবং গরীব হলেও মেয়েটিকে তিনি শিক্ষা দিতে কার্পণ্য করেন নি। এখন একটি সৎপাত্রে তাকে অর্পণ কর্‌তে পার্‌লেই তিনি নিশ্চিন্ত হন, কিন্তু পেটের দায়ে এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে চাকুরী কর্‌তে কর্‌তে কখনই বা পাত্রের খোঁজ করেন, এই ছাইএর দেশে ত

চ্যাপ্টা নাক আর ইঁহুর চোখ্ দেখ্তে দেখ্তেই প্রাণান্ত, একটা দেশের লোক যদি কালে ভদ্রে চোখে পড়ে—! সুতরাং এমন জায়গায় বাঙালী বাঙালীর সহানুভূতি করবে, ও আর এমন বেশী কথা কি—ইত্যাদি ইত্যাদি। চা খেতে আস্তে রাজী হওয়ার সময় অবশ্যই সুধীর ষ্টেশনমাষ্টারের সাংসারিক ইতিহাস ও সমস্যা জান্বার এই অযাচিত সৌভাগ্য আশা করে' আসেনি। তথাপি এতক্ষণের সমস্ত কথাবার্ত্তা সে সহজভাবে যথাসাধ্য মনোযোগের সঙ্গে শুন্তে চেষ্টা করছিল কিন্তু ভদ্রলোক এই দু-দণ্ডের আলাপেই যখন তার প্রতি কোন সঙ্গত কারণ ব্যতীতই অকস্মাৎ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে একেবারে বলে বস্লেন, "দেখুন আপনি ঘরের ছেলের মতো, আপনাকে বল্তে আর লজ্জা কি? আমার মেয়েটির পছন্দ ভারী উঁচু। যার তার হাতে ত আর ওকে দেওয়া চলে না, অথচ গরীব মানুষ, বিনা যৌতুকে সৎপাত্র পাওয়া আজকাল কি দুষ্কর জানেনই ত। তবে যদি গুণ বিদ্যা রূপ দেখে আপনার মতো আজকাল-কার শিক্ষিত ছেলেরা কেউ অম্নি বিয়ে করে—," তখন তাঁর প্রভাতের এই আতিথেয়তার নিঃস্বার্থতা সম্বন্ধে একটু সন্দিহান না হয়ে উঠে সুধীর পারলে না।

দরজায় একটি মেয়ে এসে বল্লে, "বাবা চা এনেছি।"

সুধীর দেখ্‌লে ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের রূপ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করেননি, অন্য বিষয়ে যাই বলুন না কেন। মেয়েটি সাধারণ বাঙালী মেয়ের চেয়ে দীর্ঘ একটু বেশী, দোহারা সুন্দর গঠন ও উজ্জ্বল গৌর রঙ, কিন্তু বিশেষত্ব তার চোখের অসাধারণ রঙে। চোখের তারা তার একেবারে আকাশের মত নীল ও তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী রহস্যভরা।

ষ্টেশনমাষ্টার একটু বিরক্ত কণ্ঠে বল্লেন, "তোমার কি এই ছাড়া জামা কাপড় নেই সেবা ?"

একবার সুধীরের দিকে চকিতে চেয়ে টেবিলের ওপর চা ও পরোটা রাখ্‌তে রাখ্‌তে সে বিরক্ত মৃদুস্বরে বল্লে, "সকালে এর চেয়ে ভালো জামা কাপড় কবে আমি পরে' থাকি ?"

এই মেয়েটির সান্নিধ্যে সুধীরের মনে অতি কষ্টে দমন করে' রাখা বেদনাটি যেন আবার প্রবল হয়ে উঠ্‌ছিল কোন অজ্ঞাত কারণে। বনের মাঝে কুলি কল আর কাজের আবেষ্টনে যতটা মনকে ভোলানো গেছ্‌ল এই ষ্টেশনমাষ্টারের সংসারের মাঝে এসে মন ততটাই বেশী অশান্ত হয়ে উঠ্‌ল। এই মেয়েটির সূত্রে আরেকটি মেয়ের স্মৃতি হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট হবার অবকাশ পেল যেন, এবং

তার হৃদয় স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় ও হতাশায় ফিরে ফিরে হাহাকার করে' উঠ্‌ল! এই মেয়েটি সাম্‌নে থাকাতেই সে যেন আজ এতদিন বাদে তার এই নির্ব্বাসিত জীবনের নিস্ফলতা ও আশাহীন দৈন্য প্রথম সম্পূর্ণ ভাবে অনুভব কর্‌তে পার্‌লে। আশ্চর্য্য এই যে, মেয়েটির বেশ ভূষা আচরণ সবই তাকে আরেক জনের কথাই অনবরত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। তার আধময়লা মোটা রাঙাপাড় শাড়ীটি কোমরে জড়িয়ে ধরবার বিশেষ ভঙ্গীটি সেই আরেকজনের সঙ্গে একটুও না মিল্‌লেও একটি বেদনাভরা আবেগে তার অন্তর আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ছিল স্মৃতিসূত্রে!

মেয়েটি চা ও পরোটা দিয়ে চলে' যাচ্ছিল, কিন্তু প্রৌঢ় ডেকে বল্লেন, "আজ কাকে ধরে এনেছি জানিস্ ত? সে দিন যার কথা খবরের কাগজে পড়ে' শোনাচ্ছিলি সেই সুধীর বাবু।"

সুধীর প্রৌঢ়ের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হবে কি হাস্‌বে ভেবে পাচ্ছিল না। মেয়েটি দরজায় ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে, "ও!"

প্রৌঢ় সুধীরকে বল্‌তে যাচ্ছিলেন, "কি রকম পরোটা ভাজা হয়েছে?' এমন সময় বাইরে থেকে চাপ্‌রাশী হাঁক্‌লে, "সাত নম্বর ডাউনের টাইম হোইল।"

ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে পড়্‌লেন; সুধীরও

অপ্রস্তুত হয়ে উঠ্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি তাকে উঠ্‌তে নিষেধ করে' বল্লেন, "দোহাই সুধীর বাবু, খাওয়া না শেষ করে' উঠ্‌বেন না। আমি এখুনি আস্‌ছি, আপনার লজ্জার কোন কারণ নেই জান্‌বেন।" বলে' সুধীরকে প্রত্যুত্তর দেবার অবসর না দিয়েই টুপী মাথায় দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অগত্যা সুধীর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মাথা নীচু করে' খেতে লাগ্‌ল।

কিন্তু আহার থেকে ক্ষণেকের জন্যে মাথা তুলে একবার চেয়েই সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মেয়েটি ঠিক তেমনি ভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাস্‌ছিল।

ষ্টেশনমাষ্টারের সমস্ত আলাপ এই সঙ্গে মনে পড়ে' যাওয়ায় বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে' উঠ্‌ল। সে ভাব্‌লে, "এরা এমনি করে' ছেলেধরার ফাঁদ পাতে নাকি?" বিতৃষ্ণা তার মুখেও একটু ফুটেছিল বোধ হয়।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই এমন চিন্তা একবারও মনে স্থান দেবার জন্য তাকে একান্ত অনুতপ্ত ও নিজের কাছে বিষম লজ্জিত হতে বাধ্য করে' মেয়েটি বল্লে, "বাবা এতক্ষণ আপনার কাছে নিজের দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতে ভোলেননি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু দোহাই আপনার, ওইটুকু থেকেই তাঁর প্রতি অবিচার করে' আমার সম্বন্ধে একটা অন্যায়

ধারণা পোষণ করে' যাবেন না।" মেয়েটীর মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠেছিল, তারপর মুখ ফিরিয়ে চাপা স্বরে বল্লে, "আপনি একবেলার জন্যে আমাদের অতিথি হয়ে তাঁর অসঙ্গত আচরণে অত্যন্ত অস্বস্তি ভোগ করছেন, তাই বল্‌ছি যে তাঁর যে দুর্ব্বলতাটুকু দেখেই আপনি তাঁর সম্বন্ধে একটা অন্যায় অবিচার করে' বসেছেন সে দুর্ব্বলতার দরুণ লজ্জা আপনার চেয়ে আমার অনেক বেশী। কিন্তু এইটুকু শুধু জানবেন, ও তাঁর সঙ্গে আরো একটু পরিচিত হলেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে সে দুর্ব্বলতাটুকু ছাড়া কোন হীনতা তাঁর মধ্যে নেই···ওকি! সব ফেলে রাখছেন যে! না না সে হবে না, এত কথা শোনবার পরও কি আপনি আমাদের আরো..." মেয়েটি আর বল্‌তে পার্‌লে না।

চায়ের বাটী টেবিলে রেখে সুধীর বল্লে, "না খাচ্ছি, কিন্তু তার আগে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা দরকার আমার। আমি···"

"না না ক্ষমা চাইবার কোন কথাই নেই। আপনি শুধু ভুল করে' অবিচার না কর্‌লেই অত্যন্ত বাধিত হব।"

"যে অবিচার করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত না কর্‌তে পার্‌লে আমার মনে যে শান্তি পাব না কিছুতেই।"

মেয়েটি এবার একটু হেসে বল্লে, "প্লেটে যা আছে তার

ওপর আরো গোটাকতক পরোটা আর খানিকটা মোহন-ভোগের সঙ্গে উদ্ধার করলেই যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হবে।"

"প্রায়শ্চিত্ত অত মধুর করলে পাপের প্রশ্রয়ই দেওয়া হবে।"

"প্রায়শ্চিত্ত কঠোর করলেই যদি পাপের মূলোচ্ছেদ হত তা হলে আজ পৃথিবীর চেহারা অন্য রকম দেখতুম। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ত কোথাও সহজ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেন নি।"

"তা হলেও সহজ করার চেয়ে কঠিন করার ফল হ'ত বেশী।"

"সে বিষয়ে নিঃসংশয় হইনি এখনো। যাই হোক্ আপনার কঠোর প্রায়শ্চিত্তেই যদি অভিরুচি থাকে তা হলে আমাদের আপনার অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল দেখিয়ে দিন, তা হলেই হবে।"

"আপনি 'কঠোর'-শব্দটাকে অমন করে' অপদস্থ করবেন না।"

সেবা হেসে উঠ্‌ল; বল্লে, "তা হলে আমি পারলুম না, আপনার প্রায়শ্চিত্ত আপনিই ঠিক করুন।"

"পৃথিবীর সব বিচারকর্ত্তা যদি এমনি সদয় হত—"

"যদি সব পাপী এমনি শাস্তি নেবার জন্যে উদ্‌গ্রীব

হত। আর তা ছাড়া আমি ত আপনার বিচারকর্ত্তা নই।”

দুজনেই হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। এইটুকুর মধ্যে কথায় কথায় এতটা সহজ আলাপের সূত্রপাত হওয়াটা সেবার মনে হচ্ছিল ভালো হয়নি—যদিও তার কোন হাত ছিলনা এতে। সুধীরের সহসা মনে পড়ে' গেল সেদিন এই বিচার করবার অধিকার সহজ বিশ্বাসে খাটাতে গিয়েই না জীবনের প্রথম নিদারুণ আঘাত সে পেয়েছিল। সে ভাব্‌ছিল, যে অধিকার তার নয়, সেই অধিকার থাকার বিশ্বাস তার এসেছিলই কোথা থেকে? পৃথিবীর আর কাউকে ত সে অমন করে' তিরস্কার কর্‌তে যেতে পারেনা। এ দুঃসাহস তার হয়েছিলই কেন?

সেবা বল্লে, “আপনার জন্যে আর দুটো পরোটা ভেজে নিয়ে আসি?”

অন্যমনস্ক ভাবে সুধীর বল্লে, “আচ্ছা।” তারপর ভাব্‌তে লাগ্‌ল, চারুর শৈশবে ও কৈশোরের স্নেহ প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল তারই, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাক্‌তে পারে না, এবং সেই প্রীতির জোরেই সে সেদিন অমন করতে যেতে সাহস করেছিল। কিন্তু চারুর যৌবনের প্রেম যে আরেকজনের হতে পারে এ কল্পনা ত তার মনে স্থান

পায়নি।—যেখানে প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল কৈশোরে, সেখানে যৌবনে ভালোবাসা জাগাটাই স্বাভাবিক ছিল না কি? তবু কেন সে ভালোবাসা জাগেনি? এই না-জাগার কারণ সবটাই কি চারুর দোষ ও উৎপলের প্রবঞ্চনা, তার নিজের অবহেলাটাও কি কিছু নয়? এই দিক থেকে বিচার সে কোন দিন করেনি। আজ তার মনে হল, চারুর ওপর সে যখন জোর করে' দাবী খাটাতে গিয়ে বিফল হয়েছে—প্রত্যাহত হয়েছে, উৎপল তাকে তখন প্রণয়ের অর্চ্চনা মুগ্ধ হৃদয়ের স্তুতি দিয়ে ধীরে ধীরে জয় করেছে।

সেবা এসে তার প্লেটে আরো খাবার দিয়ে বল্লে, "কি ভাব্‌ছেন বলুন ত। হাত যে উঠ্‌ছে না।"

"না, এই যে খাচ্ছি।" সুধীর যন্ত্রচালিতের মত খেতে-খেতে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, 'যার অভাবে তার দিন ও রাত্রি এমন দুঃসহ হয়ে উঠ্‌ছে, তার কাছে নিজের মর্য্যাদাকে একটু ক্ষুণ্ণ হতে দিলেও এমন কি দোষ হত! যে প্রেম জীবনের চরম ও পরম পুরস্কার, যার জন্যে বিশ্বময় এত সংগ্রাম এত তপস্যা এত ক্রন্দন এত হাহাকার, সেই দুর্লভ প্রেম, কি মূর্খ সে, শুধু একটুখানি হাত বাড়িয়েই পেতে চায়! এবং হাত বাড়িয়ে না পেলেই কি নিজের ক্ষুণ্ণ অহঙ্কারকেই

এত বড় করে' এমন করে' অভিমানে সরে' দাঁড়াতে হয়! সত্যিই ত, কি মূল্য সে দিয়েছে এত দিন এই অমূল্য প্রেমের, কি ত্যাগ কি সাধনা সে করেছে! সে দিন অমন করে' প্রত্যাহত হবার পরও কি তার আর কিছু করবার ছিল না?...'

ষ্টেশনমাষ্টার ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বল্লেন, "একটু দেরী হয়ে গেছে সুধীর বাবু, মাপ করবেন। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম।"

সুধীর সজাগ হয়ে বল্লে, "না কষ্ট কই দিলেন, এরকম কষ্ট পাবার সৌভাগ্য আর কদিন হয়!"

প্রৌঢ় হাস্‌লেন, তার পর মেয়েকে না দেখে বল্লেন, "বাঃ, সেবা গেল কোথায়?" সুধীরের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে' সেবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছ্‌ল, সুধীর তা লক্ষ্য করেনি। সেবা ঘরে ঢুক্‌তে তিনি বল্লেন, "বেশ অতিথি-সৎকার হচ্ছিল ত তোমার! উনি একলা এ ঘরে বসে' আছেন—"

সুধীর বাধা দিয়ে বল্লে, "না না উনি ত এতক্ষণ আমার সঙ্গে আলাপ কর্‌ছিলেন।"

প্রৌঢ় এবার হেসেবল্লেন, "আমার মেয়েকে কি খুব বোকা দেখ্‌লেন?"

স্থধীর মনে মনে হেসে বল্লে, "মোটেই না।"

সেবা বিরক্ত মুখে চোখ নামাবার আগে স্থধীরের সঙ্গে একবার তার চোখোচোখি হয়ে গেল।

স্থধীরকে টমটমে তুলে দিয়ে ষ্টেশনমাষ্টার বল্লেন, "দেখ্‌বেন একেবারে ভুলে যাবেন না। আপনার মতো লোকদের বাড়ীতে পাওয়া কি কম সৌভাগ্য !"

ক্যাম্পে ফিরে স্থধীর হুখানি চিঠি পেলে।

মা লিখেছেন..."—বাবা, আর এমন করে' থাক্‌তে পারি না। কত দিন আর এমন করে' বনবাসে পড়ে' থেকে আমায় কষ্ট দিবি ?" স্থধীরের চোখ অশ্রুতে ভরে' এল ; নিষ্ঠুর সে, নিজের অন্যায় অভিমানে মাকেও এমন করে' সে ব্যথা দিচ্ছে কোন্ অপরাধে ?

অন্য চিঠিটায় উৎপল লিখেছে—"আমি তোমার কাছে কি এমন দোষ করেছি ভাই, যার জন্যে তুমি এতদূরে যাবার সময় একবার একটু খবরও দেবার সময় পেলে না, —আমাদের এতকালের বন্ধুত্ব !—দেশশুদ্ধ লোক তোমার আজ জয়গান গাইছে ভাই, কিন্তু আমি তাতে যোগদান করতে পারব না, ক্ষমা করো। আমার ভাব্‌লে কান্না পায়। তুমি কি সর্ব্বনাশ করছ, বুঝ্‌তে পারছ কি ? সাগরপারের বিদেশী সদাগরের ইঙ্গিতে তুমি ভারতের যে

লীলাময়ী স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী ঝর্ণাকে বন্দী করে' দেশকে চমৎকৃত করে' দিয়েছ, তারি সঙ্গে যে দেশের মুমূর্ষু প্রাণেও তুমি লোহার শেকল লাগালে ভাই। সাতহাজার মুখের ক্ষুধার অন্ন বিক্রয় করে' দিলে, সাতশ মুজুরের মনুষ্যত্ব যন্ত্রাসুরের কাছে বলি দিলে, দেবতার দেওয়া সাতশ জীবনের সমস্ত আশা ও আশ্বাস ভস্মসাৎ করে' দিলে আর ভবিষ্যতের সাতকোটী সন্তানের জন্যে জীবনব্যাপী দুঃখদৈন্য ও হাহাকারের উত্তরাধিকার কায়েমী করে' গেলে।... পৃথিবীতে ত দুঃখ দৈন্যের অবিচার অত্যাচারের অভাব নেই ভাই, তুমি কেন তাতে আর যোগ দিতে যাও?— যন্ত্র হয়ত যন্ত্রদেব বিশ্বকর্ম্মার, কিন্তু আজ তাতে যাঁর ভর হয়েছে তিনি কোন্ অসুর জানি না, তবে বিশ্বকর্ম্মা নন্। অসুরের পূজা ছাড় ভাই।..."

সুধীর তার উত্তরে লিখ্‌লে—"তোমার সমস্ত অসার ভাবুকতা আর ভূয়ো কবিত্ব গোল্লায় যাক্, আর তার সঙ্গে তুমিও।—"

বাইশ

একটা বিলিতি কোম্পানীর একখানা সমুদ্রগামী মাল-জাহাজ অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নিতে আজ প্রায় দিন পনেরো হল নোঙর ফেলে জিরুচ্ছে। শীগ্‌গিরই আবার যাভা থেকে চিনি নিয়ে ভারতবর্ষের দিকে পাড়ি দেবে।

আজকে সেই জাহাজে ভারতীয় ডাক এসে পৌঁচেছে। জাহাজের একটা ছোট্ট কেবিনে দোতলার বার্থের ওপর একটি বাঙালী তরুণ পালক-দেওয়া বালিশে মাথা রেখে শুয়ে ছিল। সকাল থেকে খেটে-খেটে তার সমস্ত দেহে বেদনা ধরে' গেছে, তার আর নড়্‌বার ক্ষমতা নেই। ছেলেটি খাকীর হাফ্‌-প্যাণ্ট পরা, তাতে জায়গায়-জায়গায় কয়লা ও পেট্রলের দাগ লেগে নোংরা হয়ে আছে। সমস্ত ঘরটি আবর্জ্জনা ও ধূলোয় ভরা, ভারী গরম, ছেলেটির লম্বা কালো রুক্ষ চুলগুলি কপালের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে, তার তলায় নীল আকাশের স্বপ্নভরা দুটি ছলছল চোখ। ছেলেটি বি-এ পড়্‌ছিল, হঠাৎ কোন্ খেয়ালে যে

সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এই জাহাজ কোম্পানীতে সামান্য মার্কনি ওয়াচারের চাকরী জুটিয়ে নিরুদ্দেশের না' ভাসালে কেউ জানে না। আজ প্রায় তুটি বছর ধরে' ছেলেটি ঘরছাড়া।

স্নুখানি একখানি ট্রে করে' অনেকগুলি চিঠি কাগজ-পত্র, ম্যাগাজিন নিয়ে এসে টেবিলটার ওপর রেখে চলে গেল। ছেলেটী নীচু হয়ে হাত বাড়িয়ে চিঠিগুলি নিলে, এই কাগজের স্তূপের মধ্যে কোন্ কোহিনুরের আশায় একবার ব্যাকুল হয়ে কি খুঁজলে,—রোজই সে এমনি খোঁজে আর রোজই সে এমনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিঠিগুলি ভুল করে' বুকে চেপে ধরে। প্রথম খামখানা দেখ্‌তে পেয়েই ছেলেটির হাতের লেখা ঠাহর হল, আর সে না এগিয়েই চিঠিখানি খুলে পড়্‌তে সুরু করল—গিরিডি।

বাবুল,

কি যেন কথা বল্‌তে চাই বল্‌তে পার্‌ছি না। বুকের ভেতর কি কথার ভিড় বন্ধ ঘরে মৃগনাভির তীব্র ঘ্রাণের মতো নিবিড় হয়ে উঠেছে, তবু বল্‌তে পার্‌ছি না। কত রকমের কত কথা, তার না পাই খেই, না পাই ফাঁক। হাস্নাহানার বন্ধকুঁড়ির মতো প্রকাশের ব্যথায় টন্‌টন্ করছে সমস্ত প্রাণ, কিন্তু পার্‌ছি না বলতে। কাল থেকে কতবার

ছন্দে দুলিয়ে দিতে চাইলুম, পারলুম না, ছন্দ দোলেনা আর! বোবা বাঁশী যেন আমি, ব্যাকুল সুরের নিশ্বাস শুধু দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, বাজতে পারছে না। কত কথা ভাই, — যদি বলতে পারতুম!

নিজেকে খালি শুধাই - এ আমি কোথায় এলাম? আকাশের ঐ উদার নীলিমা, ধরিত্রী-মার এই শ্যামল ক্রোড়, নব তৃণাঙ্কুরের এই জীবন-সমারোহ, মন্থরগতি চলচ্ছন্দা তটিনীর এই উর্ম্মি-গুঞ্জরণ—আমাকে এখানে পাঠালেন কেন বিশ্বশিল্পী? এত লাবণ্য এত ভুখ, এত ব্যথা এত সৌন্দর্য্য কেন দিলেন তিনি? সত্যি ভাই বাবুল, সুন্দর এ পৃথিবী! জানি, এখানে কত নিষ্ঠুর অত্যাচার, কত কলুষিত স্বার্থান্ধতা, কত কুৎসিত রোগ, বীভৎস দারিদ্র্য কত দম্ভ ব্যাভিচার, জঘন্য লালসা,...কিন্তু ভাই, তারপর ঐ হলুদ-বরণ গাঁদা ফুলটির পাশে একটি প্রজাপতিকে রঙচঙে পলকা দুটি পাখা মেলে উড়তে দেখি, ম্লান সন্ধ্যালোকে নির্জ্জন শীর্ণ নদীর কোল বেয়ে স্বপ্নের মতো পাল তুলে ছোট্ট 'একখানি না' নদীর জলে গাঙশালিকের ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে যায়, দিবালোকের রাঙা চিঠি পড়বার জন্যে রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারে লক্ষ লক্ষ কুঁড়ি ধীরে ধীরে গোপনতার অবগুণ্ঠন খুলে স্মিত-আরক্ত মুখে চেয়ে থাকে—ভারী সুন্দর

এ পৃথিবী! গোধূলির রাঙা আলো ধূসর নীল পাহাড়ের গায়ে কেমন চুপটি করে' মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে' থাকে, পাহাড়ে-বনে কি মধুর সঙ্গীত ওঠে দিন-রাত, মনে হয় আমার জন্য ভুবনশিল্পী কত সৌন্দর্য্যের কত প্রাচুর্য্যের যে আয়োজন করেছেন তার আর অন্ত নেই, নেই।...

কি হবে বাবুল, ভাই, জীবনের ঘানি টেনে টেনে অমন নিরুদ্দেশ চলায়, কি হবে ভাই যন্ত্রাসুরের ব্যর্থ পূজায় চিত্ত নিবেদন করে'? শান্তি কি সত্যিই পাস্ তোরা ঐ চিমনীর ধোঁয়ায়, ইঞ্জিনের চীৎকারে, বয়লারের হুহুঙ্কারে? তার চেয়ে আয় ভাই বাবুল্ মাটী-মার এই ঠাণ্ডা কোলখানিতে, এই শান্ত উদাস পাহাড়ের নীচে বাঁশীর সুরের মতো ক্লান্ত রাঙা মাটীর সরু পথটির কিনারায়, যাকে ভালোবাসিস্ তার কথা ভেবে দুটি ফোঁটা চোখের জল ফেল ভুঁয়ে, আর এই অনন্ত রাত্রির বিনিদ্র প্রহর জেগে-জেগে নক্ষত্রদীপ্ত আকাশের কবিতা শোন্। জীবনের পেয়ালা নে, সারঙ্ বাজা, অমন করে' ঘানি টানিস্ নে,—তোর আর সুধীরের কথা ভাবলে সত্যি-সত্যিই আমার কান্না পায়, যখন ভাবি এই জীবনকে নিয়ে তোরা কি ব্যর্থ জুয়ো খেলতে বসেছিস্!...

পৃথিবী যে এত সুন্দর, আগে কোনোদিন বুঝিনি।

মাটীর বুকে কান পেতে পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুন্‌তে পাচ্ছি, আমার বুকে ভূমিকম্পের স্পন্দন উঠ্‌ছে। কে যেন ভাই চোখে অঁাজন বুলিয়ে দিয়ে গেল,—ভোরের আলোর সোনার কাঠি—সব সুন্দর লাগ্‌ছে! পাহাড়ের নীচে এই যে শুকনো ঝরা পাতাগুলি অস্ফুট মর্ম্মর তুল্‌ছে হাওয়ায়, ঝির্‌ঝির্ করে' ওপর ডালের ঐ যে কয়েকটা খেজুর পাতা কাঁপছে, ঐ যে একটা পাথর কতকাল ধরে' এই কাঁকর-বিছানো পথের ধারে নিশ্চল হয়ে রয়েছে, কত পথিকের স্পর্শ পেয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে আনন্দে, ঐ যে ঘাসের ডগাটি ম্লান সন্ধ্যালোকপানে স্তিমিত চোখে চেয়ে বেদনায় একটু কাঁপছে, ঐ যে শাদা মেঘটার ধারে আব্‌ছা লালের একটু দাগ—সব যেন বিরাট রহস্য-ভরা চমৎকার! সবাইকে হৃদয় দিয়ে যেন স্পর্শ কর্‌ছি। মনে হচ্ছে আমি যেন দেবতা!···

আমি ভালোবাসি, আমার এই ছোট বুকে এত গৌরবের স্থান কৈ? জীবনকে যৌবনকে কী যে মধুময় লাগ্‌ছে ভাই বাবুল, বলতে পারছি না। ভাব্‌ছি, যারা জীবনে ভালোবাসার স্বাদ পেলেনা কোনোদিন, তাদের মতন হতভাগ্য আর নেই, তারা এই বিপুল জীবনের রহস্যকেই অপমান কর্‌লে, তারা নিজেদের মহিমাকে তুচ্ছ করে' কত

ক্ষুদ্র নগণ্য ও হতাশ হয়ে রইল। ভাই বাবুল, আগে এই ভালোবাসা নিয়ে কত ভুয়ো কবিত্ব করেছি, এখন মনে হচ্ছে ও একেবারে মিথ্যা আজগুবি। ভাব্ছি—একে রূপ দেওয়া যায়না, ভাষা ভেঙে পড়ে, শুধু রাত্রির অন্ধকার রহস্য-লোকের পানে চেয়ে একে বোঝা যায়।···ঝির্ঝির্ করে' ঠাণ্ডা একটু বাতাস এসে কপালে লাগ্ছে কার স্নিগ্ধ নরম হাতটির বুলানির মত,—এই পৃথিবীকে প্রণাম কর্ছি ভাই। সমস্ত পৃথিবী আমাকে যেন কি জিগ্গেস কর্ছে করুণ নয়নে চেয়ে, সন্ধ্যাতারার চাহনিটি কি ম্লান, আমি প্রশ্ন বুঝ্তে পার্ছি, কিন্তু জবাব দিতে পার্ছিনা।

ভাই, সকল ভালোবাসার মধ্যে একটি ক্লান্তি একটি অপরূপ ব্যথার স্বাদ আছে। কেন যে এই ব্যথা এর সংজ্ঞা দিতে পারি না। ভারী মিষ্টি এই ব্যথাটি! একে চোখের পাতায় রাখি, আর এই ব্যথাটি গলে' ঝরে' পড়ে। ভারী ভালো লাগে। তাকে পাব কি পাব না, সে সব কিছু ভাবিনা, শুধু ভাবি তাকে ভালো লাগে, তাকে ভালোবাসি, সে আমার চোখে এই পৃথিবীকে সুন্দর মধুর পবিত্র করে' তুলেছে। কোথা থেকে কোন্ অনাদি অসীমের বার্তা সে নিয়ে এল তার আঁখির তারায়, তার দুটি হাতের স্পর্শে—

আমি সেই ডাকে বেরুলাম পথে-পথে ঘরছাড়া আর নামহারাদের দলে।...

সেদিন সে অর্গ্যানটার সাম্‌নে বসে' একটা বসন্তের গান গাইছিল। গানটি গেয়ে সে চুপ কর্‌ল। সে-চুপ-করে' চেয়ে-থাকাটির মধ্যে যে এত গান আছে, আমি জান্‌তুম না। আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম সেই স্তব্ধতার সুর শুনে। আস্তে-আস্তে একটি আঙুল দিয়ে তার বাঁ হাতের একটি আঙুল স্পর্শ কর্‌লাম, তারপর আর-একটি দিয়ে আর একটি। খানিকক্ষণ রইলাম,—আমার সমস্তটা দেহ যেন একটি সেতার—তারপর আবার আস্তে-আস্তে আঙুল দুটির ক্ষণিক বন্ধুত্ব ঘুচিয়ে দিলাম। একটি চুল হাওয়ায় তার চেয়ারের হাতলটার ওপর একটু কাঁপছিল, এটিকে ছোঁবার জন্য আমার সমস্ত দেহ উৎসুক ব্যগ্র হয়ে টলছিল, খুব ধীরে ধীরে সেটিকে স্পর্শ করলাম, তারপর আস্তে-আস্তে তার গহন-কালো শাড়ীর লাল-পাড়টি! ভাই বাবুল, কিছু মনে করিস্‌নি, এই প্রেমের নেশা আমাকে উদাস করে' তুলেছে, ভারী ভরে' আছে বুক, তুই ছাড়া আর কেউ নেই যাকে এ বোঝাই, কে-ই বা বোঝে? বঁটিতে তার বাঁ হাতের একটি আঙুল কেটে গিয়েছিল, সেই রক্তে লালিয়ে-ওঠা তার আঙুলের ডগাটি আজো আমি ভুলিনি।...

একদিন সে এস্রাজ বাজাবার ভঙ্গীতে পা দুটি সাম্‌নের দিকে কাৎ করে' গুটিয়ে চুল বাঁধছিল হাত দুখানি দুলিয়ে, আর পাংলা দুটি ঠোঁট্‌ ফুলের পাপ্‌ড়ির মতন কাঁপিয়ে আমার কবিতার প্রশংসা কর্‌ছিল। চুল বাধা সাঙ্গ হওয়ার পর দেখি, হাওয়ায় চিরুণী-থেকে-খসা তার রুক্ষ ছেঁড়া চুলের কতগুলি গুছি মেঝেয় উড়ছে, তার অলক্ষিতে সেই চুলগুলি পকেটে পূর্‌লাম। আমার প্রাণে এ কিসের প্রলোভন বুঝি না। ঐ চুল দিয়ে আমি কি কর্‌ব? তবুও চুলগুলি একটা চওড়া লেপাফায় করে' ট্রাঙ্কের তলায় লুকিয়ে রেখেছি।—

তার একদিন একটু বেশী জ্বর হয়েছিল। আমি পাশে বসে' তার মাথায় হাওয়া করছিলাম। জ্বরে রাঙা শুক্‌নো মুখখানা যে কি সুন্দর লাগ্‌ছিল, বাবুল্‌! হঠাৎ সে আমার হাতদুটো ধরে' ফেলে উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লে, "তুমি এসেছ? এতদিন বাদে মনে পড়ল?"…সবাই বল্‌ছিল মেয়েটা প্রলাপ বলছে, বেশী করে' আইস্‌ব্যাগ দাও, কিন্তু জানিস্‌ ভাই বাবুল, সেই নিবিড় স্পর্শটি এখনো যেন আমার দেহের বীণায় বাজ্‌ছে। তার পর সে আমাকে আর তেমন স্বরে সম্বোধন করেনি বটে, কিন্তু ব্যথাভরা করুণ চোখে চেয়েছে। সে আমাকে ম্লান কণ্ঠে

বলত—"তুমি এখন বাড়ী যাও উৎপল দা, আর কত রাত জাগ্‌বে?" আমি তার কপালে হাত রেখে বল্‌তাম,—"আমার জন্য ব্যস্ত হয়োনা লেখা, আমার ঘুম আসে না।" সে আর কথা কইত না, চুপ করে' থাকৃত। বল্‌তাম—"তোমার ঘুম আস্‌ছে না?" সে বল্‌ত, "না।—তুমি বাড়ী যাও।"—ভাব্‌তাম, আমার আরামের জন্য সে—কিন্তু ভাই বাবুল্‌, সে কি জানে তা'র শিয়রে বসে' কত দীর্ঘ বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়ে দিতে পারি!

তেলের বাতিটি ঘরের এক কোণে জ্বল্‌ত, আমি আব্‌ছায়ায় তার শিয়রে বসে' রুক্ষ চুলগুলিতে হাত বুলাতাম, পাখা কর্‌তাম, আর ভাবতাম—এই গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের যুগে আমরা এবার বাংলা দেশে এসে জন্মালাম। সৃষ্টির আদি কাল থেকে আমরা দুজন প্রেমের নব নব খেলা খেলে এসেছি কভু মিলনে কভু বিরহে। কত জন্মে দান্তে আর বিয়াত্রিস্‌, কীট্‌স্‌ আর ফ্যানী, ব্রাউনিঙ্‌ আর ব্যারেট। তাকে নিয়ে কত feud, কত bot, কত দ্বন্দ্ব, কত যুদ্ধ, তাকে নিয়ে কত মড়কে কাঁদ্‌লাম রুষিয়ায় ফ্রান্সে একটুকরো রুটির জন্য, তার জন্য কত কাঁদ্‌লাম আরব-তাতারে দেশে-দেশে ভিক্ষু সন্ন্যাসীর বেশে, কতবার বেদে আর বেদেনী

হয়ে পথের পর পথ পার হয়ে গেলাম গাঁয়ের পর গাঁ! আবার এই জন্মে এই সবুজ বাংলার ঘরে নূতন খেলা খেল্‌তে এসেছি, এই জীবনের কি বিচিত্র সমারোহই যে চলেছে অনন্তকাল ধরে'! অন্নদাবাবু বল্‌তেন—"পাশের ঘরে তোমার বিছানা করিয়েছি. তুমি এবার শোওগে।" মা বল্‌তেন—"আইস্ ব্যাগ্‌টা এবার আমাকে দাও।" আমি বল্‌তাম—"না, আরো একটু রাত জাগি।"

ভাই বাবুল্, জীবন-দেবতাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নমস্কার কর্! আমাদের তিনি কত দিলেন—এই তারায় ভরা মৌন রাত, এই ফেণশীর্ষ উর্ম্মিক্রান্ত সমুদ্র, এই উদার নীলিমাঞ্চিত আকাশ, এই রসসিঞ্চিত পৃথিবী! মার ক্রোড় প্রিয়ার বুক বন্ধুর হাত,...আমরা কি সব-কিছুরই যোগ্য? একবার ভাব্ বাবুল, কত কিছু তিনি দিলেন—কত লাবণ্য কত আশা কত মাধুর্য্য কত অতৃপ্তি! কিছুরই কি আর শেষ আছে ভাই? আমরা সব কিছুরই কি মান রাখ্‌তে পেরেছি? কত অপচয় না কর্‌লাম—কত অপমান! তাতেও তিনি দুঃখিত হলেন না, তৃপ্ত হলেন না, আমাদের তিনি পাবার জন্যে বাঁধ্‌লেন কত মায়ায় কত মোহে কত প্রণয়ে। আমি তাঁকে যেন দেখ্‌লাম, তিনি যেন কার দুটি চোখে আমাকে ডাক দিলেন। আমি সেই ডাক

শুনেছি, আমি নিজেকে আর ধরে' রাখ্‌তে পারছি না। অসীম আমাকে ডেকেছে।

শীগ্‌গিরই আবার কল্‌কাতা ফিরে যাব। এখানে এসেছি শুধু দূর থেকে তাকে একটা চিঠি লিখে একখানি জবাব পেতে তার। হয়ত তাকেও পেতে পারি, জানিনা আমার তপস্যা পূর্ণ হয়েছে কিনা, হয়ত হয়েছে, হয়ত সে আস্‌বে। ভাব্‌তে পাচ্ছি না, সমস্ত প্রাণ কিশলয়ের মতো কাঁপ্‌ছে! যাবার বেলায় সে যে দুয়ার ধরে' পথের পানে চেয়ে থাকৃত, সেই সুরটি এসে মনে লাগ্‌ছে। আর লিখ্‌তে পাচ্ছি না। এখানকার হাওয়ায় তার ভিজা চুলের গন্ধটি যেন পাচ্চি। অনেক বাজে কথা বল্‌লাম হয়ত, ক্ষমা করিস্‌, যদি কোনোদিন ভালোবেসে থাকিস্‌, তবে হয়ত বুঝ্‌তে পার্‌বি কিছু।

সুধীরের কথা সব জানিস্‌ হয়ত, খুব নাম কিনেছে ও। বাঙালীর গৌরব! কিন্তু কি হবে ভাই ঐ যন্ত্রের যজ্ঞে সহস্র নিরপরাধ দরিদ্রদের আহুতি দিয়ে, কলুষে কদর্য্যতায় সমস্ত দেশকে পীড়িত করে'? তাকে চলে' আস্‌তে বলেছিলুম, কিন্তু সে আমাকে গোল্লায় যেতে উপদেশ দিয়েছে।

গোল্লাকে সত্যিই তোরা চিন্‌লি না, মনে হচ্চে, প্রতি জন্মে এম্‌নি গোল্লায়ই যেন যেতে পারি। আমি জানি,

ভারী দরাজ মন সুধীরের, যাকে ও আঁকড়ায়, বিপুল আগ্রহেই তাকে আঁকড়ায়, আঁচড়ায়, কিছুতেই তাকে সে ছাড়্‌তে চায় না। তাকে যখনই আমি দেখি, তখনই সেজদার The Lord of Darkness মূর্তিটার কথা মনে পড়ে,—দুটি চোখে সেই জ্যোতির স্বপ্ন, সেই নিবিড় রাত্রির ঘনিমার রূপ তার পেশীবহুল দৃঢ় দেহে, আর সেই মেঘের মুগ্ধ রাত্রির অপরূপ লাবণ্য তা'র তারুণ্যমণ্ডিত মুখখানিতে! সে যাকে চায় না, তাকে এম্‌নি ক'রেই চায়না। কিন্তু আমি জানি ভাই, ওর ভুল ভাঙ্‌বেই, জীবনে ঐ ভুল না ভেঙে পারে না। হয়ত অনুপাতে তেম্‌নি আবার আঘাত চাই। যন্ত্রের সঙ্গীতের সঙ্গে প্রেমের বাঁশীর সুর কে মেলাবে?

চিঠিটা প্রকাণ্ড হয়ে গেল। পাছে শ্রান্ত হয়ে পড়িস, সেই ভয়ে আর এগোলাম না। কল্‌কাতায় কবে তোর জাহাজ এসে পৌঁছুবে? বিয়ের লাল চিঠি দিয়ে তোকে এইখানে লট্‌কে রাখ্‌ব, আর ছেড়ে দোব না। ভাই বাবুল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই জীবনদেবতাকে নমস্কার কর্! ইতি।

উৎপল।

চিঠি পড়্‌তে পড়্‌তে ছেলেটির দুই চোখ জলে ভরে'

উঠ্‌ল। সে একবার ক্লান্ত উদাস চোখে ছোট্ট কেবিনটি দেখ্‌লে। কতগুলি সিগারেটের খোলা বাক্স, রুমাল, নেকটাই, ছেঁড়া ওয়াইন-কার্ড মেঝের ধূলোয় পড়েছিল, সেগুলির পানে একটু তাকালে। চিঠিখানি বুকের ওপর মেলে রাখ্‌ল, তারপর বালিশের তলা থেকে কি একটা শক্ত পিজ্‌বোর্ডের মতো বা'র করে' বুকে চেপে ধর্‌ল।

জাহাজের গায়ে প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউটি তখন মৃদু মৃদু করতালি দিচ্ছে।

তেইশ

"মাসীমা !"

"কে মা, চারু ? আয় এই ঘরে।"

মা তখন ঘরে মেঝেয় বসে' চর্‌কায় সুতো কাটছিলেন, চারু ধীরে ধীরে তাঁর পা ঘেঁষে এসে বস্‌ল। মা চারুর একান্ত বিষণ্ণ শুক্‌নো মুখখানির পানে চেয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বল্লেন—"তোর চেহারা এখনো সার্‌ল না যে চারু ! একটুও জোর পাচ্ছিস্ না ?"

চারুলেখা চোখের পাতা দুটি নীচু করে' আস্তে বল্লে, "যে অসুখটা হয়েছিল, বেঁচে যে উঠেছি, এই ঢের।"

মা বল্লেন, "হাওয়া বদ্‌লাতে কেন যাস্‌নে ? বেলফুল বল্লে, তুই নাকি যেতে চাস্‌না একেবারে।"

"না মাসীমা, আমার কল্‌কেতাই ভারী ভালো লাগে। কোথাও যেতে চাইনে।"

মা চারুর রুক্ষ চুলগুলি হাতে নিয়ে বল্লেন, "কি জট্ পাকিয়ে আছে চুলগুলি ! বেঁধে দিই ?"

চারু ঘাড় নাড়্‌লে।

চুল বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে মা বল্লেন, "পরশু তো অন্নপূর্ণার বিয়ে হচ্ছে, জানিস্ ?"

"হ্যাঁ, আমাকে অনেক করে' যেতে বলে' দিয়েছে।"

"যাবি তো ?"

"না মাসীমা, আমার ভালো লাগে না কিছু।"

গলার স্বর শুনে মা বিস্মিত হয়ে বল্লেন, "সে কি রে ? তোর ছেলেবেলাকার সই অন্নপূর্ণা। যাবি নে ? কেন, ঝগড়া হয়েছে বুঝি ?"

চারুর চোখের পাতায় এক ফোঁটা জল পড়ি-পড়ি কর্‌ছিল, সে আঁচলের কোণ দিয়ে জলটি মুছে নিয়ে বল্লে, "না মাসীমা, আমি ঝগ্‌ড়া করি না। কাল অনেক করে' আমাকে যেতে বলে গেছে, কিন্তু—"

"সে কি চারু, কাঁদ্‌ছিস্ ? কি হয়েছে, আমাকে বল্‌বিনে ?"

"কিছুই তো হয়নি মাসীমা। অম্‌নি কেন যেন চোখে জল এসে পড়্‌ল।"

মা আদর করে' চারুর মাথাটি কোলে টেনে নিয়ে তরলস্বরে বল্লেন, "নিজে আইবুড় হয়ে আছিস্, তাই বুঝি পরের বিয়ের খবর পেয়ে কষ্ট হচ্ছে ?—"

চারুর চোখের জলের ওপর লাল একটু হাসির রামধনু ঝিক্‌মিক্ করে' উঠ্‌ল।

মা বল্লেন, "উৎপলের চিঠি পেলি চারু? গিরিডি গিয়ে শরীর সারছে ত ওর?"

হঠাৎ বিবাহপ্রসঙ্গের পর মাসীমার মুখে উৎপলের নাম শুনে চারুলেখার মুখ একেবারে রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। সে নিজেকে আর সাম্‌লাতে পারলে না। এতক্ষণ প্রাণপন শক্তিতে সে প্রাণের সমস্ত আবেগের মুখ চেপে রেখেছিল, তারে আর ধর্‌তে পার্‌লে না, বল্লে, "তুমি অধীরদার কোনো চিঠি পেলে? তিনি কি আর এখানে ফিরে আস্‌বেন না?"

কথার স্রোত উল্টে যেতেই মার বুকে অশ্রু উথল হয়ে উঠ্‌ল। ভারী গলায় মা বল্লেন, "সুধীর আমার একেবারে ঘরছাড়া হয়ে গেল, কেউ ওকে আর বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌লে না।—কি যে ওর দুঃখ, কিছু বুঝেও বুঝলাম না। যাবার দিন রাত্রে আর ঘুমোয়নি, খালি পায়চারি করে' বেড়িয়েছে। বল্লাম—'হাঁট্‌ছিস্ কেন অমন সুধীর?' বল্লে '—ঘুম আস্‌ছে না মা।'—এতটাকা খরচ করে' প্রকাণ্ড কার্‌খানাটা খুল্লে, তারপর হঠাৎ কেন যে তেপান্তরের মাঠের পানে ছুটল বনবাসে, আমাকে কিছুই বল্লে না, ভালো করে' কিছু বুঝ্‌লুমও না।"

"তিনি কি ফিরে আস্‌বেন না আর মাসীমা ?"

আঁচলে চোখের জল মুছে মা বল্লেন, "কি করে' বলি ? চিঠি লিখ্‌লাম, ফিরে আয়, সে খালি লেখে—'না মা, বাংলার গৌরব রাখ্‌বার জন্য যন্ত্র আমাকে ডেকেছেন, আমি আমার কাজ আধখানা রেখে যাব না। তা ছাড়া ভগবান সবাইকে একই রকম জীবন দেন নি মা, কারো হাতে হাতুড়ী, কারো হাতে বাঁশী! আমার জীবনে বাঁশী আর বাজ্‌বে না, কি হবে আমার আর ফিরে গিয়ে ? এইখানে আমি বেশ আছি।' মা চারু, মা'র ডাক সে শুন্‌লে না, কিন্তু এতবড় সংসারে আর কি কেউ নেই যে তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারে ?"

চারু ঘাড় নীচু করে' চুপ করে' রইল হাঁটুর ওপর কাতর ম্লান মুখখানি রেখে।

তার পিঠে একখানি হাত রেখে মা বল্লেন, "সুধীর তোকে সেখানে গিয়ে একখানাও চিঠি লেখেনি ?"

"না।"

খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে মা বল্লেন, "তুই একখানা আগে চিঠি লেখ্‌না মা চারু, তাকে বল্, সবাই তাকে ফিরে আস্‌তে বল্‌ছে,—দ্যাখ্‌না সে কি জবাব দেয়।"

"তিনি জবাব দেবেন না মাসীমা।"

"কে বল্‌লে জবাব দেবেনা ?"

"আমি জানি।"

"না না দেবে, তুই লেখ্‌না একখানা চারু। আমি ত জানি, তুই লিখ্‌লে সে শত কাজে ব্যস্ত থাকলেও জবাব দেবেই।"

চারুলেখার জলে-ভিজা দীর্ঘায়ত চোখের পাতাদুটি একটু কেঁপে উঠ্‌ল. সে ঘাড়টি আর একটু নীচু করে' কান্নাকাঁপা গলায় বল্লে, "আমি লিখ্‌তে পারব না মাসীমা।"

"কেন, কেন মা চারু ?"

চারু মাথা তুলে বল্লে, "চিঠি লিখে ডেকে আনার হীনতাকে আমি সহ্য করতে পারছি না। তিনি যদি আমাদের ভালোবেসে থাকেন, তবে তাঁর আপ্‌নার থেকেই চলে' আসা উচিত। আমাদের ওপর তাঁর যদি কিছুমাত্র স্নেহের দাবী থেকে থাকে, তার খেলাপ্‌ করলে তাঁকেই ঠক্‌তে হবে। তাঁর এই নিষ্ঠুরতার ভুল একদিন ভাঙ্‌বেই মাসীমা, সে দিনই তিনি ফিরে আস্‌বেন। সে দিনটির জন্যে প্রতীক্ষা করে' থাকাটাই পরীক্ষা।"

মা বিস্ময়বিমুগ্ধ নয়নে চারুর আবেগদীপ্ত চোখদুটির পানে চেয়ে রইলেন।

কতক্ষণ কেউ আর কোনো কথা কইল না। মা

চরকা কাট্‌তে লাগলেন আর চারু তুলো পাঁজ্‌তে লাগ্‌ল।

হঠাৎ চারু তুলোগুলো প্যাট্‌রার মধ্যে রেখে উৎসুক কণ্ঠে বল্লে, "ওপরের বন্ধ ঘরের চাবীটা অধীরদা কি নিয়ে গেছে মাসীমা, না তোমার কাছে আছে?"

"আমার কাছেই আছে। কেন?"

"আমাকে দাও না।" চারু কথাটা বলেই চোখ নামিয়ে নিল।

মা চারুর এই আকস্মিক খেয়ালের কারণ জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কথার শেষে তার সর্ব্বাঙ্গে একটি সুন্দর ব্রীড়ার রক্তিমা ফুটে উঠতে দেখে আঁচলের থেকে চাবীর গোছাটা খুলে তার হাতে দিয়ে বল্লেন, "নে।"

চারু চাবীটা পেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মা চেঁচিয়ে ডাক্‌লেন, "কোন্ চাবীটা চিনে যা।"

চারু জবাব দিলে, "আমি চিনি।"

আস্তে-আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে চাবী দিয়ে আস্তে-আস্তে দুয়ার দুটি খুলে চারুলেখা অতি আস্তে-আস্তে ঘরে এসে ঢুক্‌ল। বিশৃঙ্খল অন্ধকার ঘরটি ধূলোয় আর আবর্জ্জনায় নোংরা হয়ে রইলেও চারুর চোখে সমস্ত যেন অপরূপ বিস্ময়ভরা পরম রমণীয় বলে' প্রতিভাত

হচ্ছিল। সে আর একটু এগিয়ে মৃণালশুভ্র গ্রীবার ওপর শাড়ীর অাঁচলটি টেনে নিয়ে ভাঙা কলকব্জার স্তূপের পাশে নত হয়ে কার উদ্দেশে বারে বারে প্রণাম করতে লাগ্‌ল। দুটি ফোঁটা চোখের জল মেঝের ধূলোর ওপর ঝরে' পড়্‌ল। দাঁড়িয়ে উঠে সে আস্তে আস্তে সমস্ত জিনিষগুলি হাত দিয়ে স্পর্শ করল। এক জায়গায় দেখতে পেলে কতগুলি মডেলের ভাঙা টুক্‌রো পড়ে আছে। সে গুলি সে অাঁচলে বেঁধে নিলে। আর কতক্ষণ বাদে দরজাটা বন্ধ না করে'ই নেমে গেল নীচে।

মা তখনো চরকা কাটছিলেন, তাঁকে বল্লে, "ঘরটা খোলাই রেখে এলাম মাসীমা, এটা খোলাই থাক্। আজ আর কিছু হোলনা, আমি আর একদিন এসে ঘরটা গুছিয়ে দিয়ে যাব।" বলেই চাবীটা মেঝের ওপর তাঁর পাশে ফেলে দিয়ে সে একছুটে বাইরে এসে পড়্‌ল।

চারুলেখা তাদের বাড়ীর মুখে এগোতেই দেখতে পেলে একখানা রাঙা মিহিশাড়ী পরে' অন্নপূর্ণা আস্‌ছে। কি সুন্দর তাকে দেখাচ্ছে আজ! বুকের গোলাপ-রঙের ব্লাউজ্‌টির ওপর সোনার হারটি কি সুন্দর একটু দুলছে, ঠোঁটের ফাঁকে আল্‌তার দাগের মতন কি হাল্কা একটি হাসি, চুলগুলি কেমন নরম করে' বাঁধা, চোখের তারায়

কেমন সুন্দর দুটি প্রদীপ জ্বল্‌ছে। চারু দাঁড়াল, অন্নপূর্ণার হাতটি ধরে' টেনে তাকে বাইরের ঘরে নিয়ে শুধোলে—"নিজেই নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছিস্ নাকি ?"

অন্নপূর্ণা একটা চেয়ারে বসে' ফিকা একটু হাস্‌লে, বল্লে, "না ভাই, নেমন্তন্ন কর্‌তে আমার ভাল লাগে না।"

"তবে ? এমন সময় ?"

ব্যথিত কণ্ঠে অন্নপূর্ণা বল্লে, "ভালো লাগ্‌ছিল না ভাই, বাড়ীর ঐ সমারোহের অত্যাচার, তাই একটু হাঁপ ছাড়্‌তে তোর কাছে চলে এলাম—"

চারু বল্লে—"খুব ফুর্ত্তি হচ্ছে বুঝি ? একা বুঝি ভালো লাগেনা ? তাই বুঝি ভাগ দিতে এসেছিস, না পূর্ণা ?"

অন্নপূর্ণা উদাস চোখে চেয়ে কান্নাভরা কণ্ঠে বল্লে,—"ফুর্ত্তি ? ভাই চারু—"

"সে কি পূর্ণা, কাঁদছিস্ তুই ?" বলে' চারুলেখা তার হাত দুটো কঠিন করে' চেপে ধর্‌ল।

অন্নপূর্ণা সেই নিবিড় স্পর্শটির ওপর সমস্ত দেহের ভর্ রেখে কান্নাগলা সুরে বলে' যেতে লাগ্‌ল—"ভাই চারু, বাংলার মেয়েরা কত অসহায়, কত দুর্ব্বল। পার্‌লুম না ভাই পার্‌লুম না, এই অবরোধের শিকল ছেঁড়্‌বার শক্তি আমাদের বিধাতা দেন নি। যাকে দিয়েছিলেন সে ঘর ছেড়ে

উধাও হয়ে চলে গেল নিরুদ্দেশের অভিসারে। ভেবেছিলুম আমাকে মুক্তি দিতে একদিন সে বুঝি আস্‌বে। কিন্তু ভাই চারু, সে আসে না, এমন করে' অধিকারের জোর দেখায় আর তার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারে না। ফুর্ত্তি?"

চারু তার মাথাটি কাছে টেনে নিয়ে কাতর স্বরে বল্লে, "এই বুক-ভরা কান্না নিয়ে আমার কাছে হাঁপ্ ছাড়্‌তে এসেছিস্ পূর্ণা! কিন্তু ভাই, আজো আমার প্রতীক্ষার ব্রত ভাঙেনি, জানি—"

ফুঁপে উঠে অন্নপূর্ণা বল্লে, "সে আস্‌বে না চারু, সে আস্‌বে না।— কিন্তু তোরা স্বাধীন সম্প্রদায়ের লোক, তুই হয়ত পার্‌বি, কিন্তু ভাই আমি পার্‌লুম না, আমার দম আট্‌কে গেল, নিজের গলায় নিজেকেই ফাঁসী পরাতে হল।"

কোথা থেকে যে এই বিপুল কান্নার শ্রাবণ নেমে এল, তাদের কারো কিছু ঠাহর হোল না। দিনের আলো ম্লান মুমূর্ষু হয়ে এলে অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি চারুর বুকের থেকে মুখ তুলে ভাঙ্গা গলায় বল্লে, "এবার যাই ভাই। তুই চেয়েছিলি আনন্দের ভাগ, কিন্তু শুধু-শুধু তোকে কাঁদিয়ে চল্লাম। একেবারে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কিন্তু যাস্ ভাই আমার মৃত্যু-অভিনয়টা দেখে আস্‌তে।"

দিয়েছেন। সে পরিবর্ত্তনে আপাত দুঃখ হয়ত অনেক আছে, কিন্তু তার কল্যাণের ইঙ্গিতকেও অস্বীকার করতে পারিনে। আর আজ যাবার সময় তার জন্যে আপনার কাছে ঋণ স্বীকার ক'রে কৃতজ্ঞতা না জানিয়েও পারিনে, যদিও সব কথা খুলে বল্‌তে আমি পার্‌ব না, এবং বলাও সম্ভব নয়।"

সেবা চেয়ারের হাতল ধ'রে তেম্‌নি দাঁড়িয়েই রইল নীরব একটি কাতর সজল দৃষ্টি মেলে!

যত কথা পৃথিবীতে আজো প্রকাশ হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী, ব্যর্থ মুকুলের মত অলক্ষ্যে নিঃশব্দে অন্তরের গোপনতায় শুকিয়ে গেছে।

ষ্টেশনমাষ্টার ঘর্ম্মাক্ত কলবরে ঘরে ঢুকে বল্লেন, "এই যে সুধীর, কখন এলে? তুমি নাকি ম্যানেজার সাহেবকে চাব্‌কে একেবারে লাল করে' চাক্‌রী ছেড়ে দিয়েছ ন্‌লাম, সত্যি?

ছাব্বিশ

ট্রেণটা আসতে দু'ঘণ্টার ওপর দেরী হয়ে গেছ্‌ল।

একটা ছ্যাকড়া গাড়ীর মাঝে সুধীর বসে' ছিল। খোলা জান্‌লাটার ওপর বাঁ হাত রেখে তার ওপর মাথা রেখে সে কি ভাব্‌ছিল আর দৃঢ় আঙুলগুলি দিয়ে নিষ্ফল নির্বাক যন্ত্রণায় দীর্ঘ চুলগুলি জোরে টান্‌ছিল। ঘুমন্ত নিশীথের কল্‌কেতার প্রায় স্তব্ধ জনহীন পথে গাড়ীটা অদ্ভুত অসহ্য কোলাহল কর্‌তে কর্‌তে চলেছে। সুধীর ভাব্‌ছিল—এ তার কি হয়ে গেল এ ক'দিনের মধ্যে? এত বড় সংসারে তার আর দাঁড়াবার ঠাঁই কোথায়? যাদের সে এত নিবিড় বন্ধনে আঁকড়ে ধর্‌লে তারাই তাকে ব্যঙ্গ করে' মিলিয়ে গেল! আজন্মের এই যন্ত্রসাধনা তার কাছে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস বলে' মনে হচ্ছিল। যাক্‌ না যন্ত্র ভেঙে ছারখার হয়ে, সে একেবারে রিক্ত নিঃসম্বল হয়েই না হয় থাকুল, কিন্তু তার দীন দুঃখী আবাসে যদি তাকে সে এ জীবনে পায় এ তপ্ত ব্যর্থ বুকের কুলায়, যদি তাকে সে

অন্নপূর্ণা উঠ্‌তে যেতেই রাস্তার থেকে তার দাদা হাঁক দিলেন, "অন্নপূর্ণা এখানে আছিস্ ?"

অন্নপূর্ণা বেরিয়ে আস্‌তেই তিনি কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন, "সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এতক্ষণ এখানে কি কর্‌ছিস্ ? এতবড় ঢেঙা হলি, এখনো হায়া হল না ? এখন এতটা রাস্তা হেঁটেই যাই আর কি !"

অন্নপূর্ণা চারুর পানে আর একটি পরম বিষণ্ণ একান্ত দুঃখী দৃষ্টি ফেলে ধীরে-ধীরে তার দাদাকে অনুসরণ কর্‌ল।

চারুলেখা ওপরে উঠ্‌তেই সুনয়নী দেবী বল্লেন, "তোর একটা চিঠি এসেছে, টেবিলের ওপর আছে।—বেলফুলের বাড়ী গিয়েছিলি বুঝি ? নীচে অন্নপূর্ণার গলা শুন্‌লাম না !"

চারু মার কোনো কথার উত্তর দেবার জন্যে দাঁড়াল না। তার চিঠি এসেছে শুনে তার সমস্ত রক্ত ঝিল্‌মিল্ কর্‌ছিল। সে ঘরে ঢুকেই আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে। যদি তিনি লিখে থাকেন চিঠিটা ! দিদির চিঠি ত বিকেলের ডাকে আসে না।

সে ব্যগ্র হাতে সুদৃশ্য গন্ধযুক্ত খামখানা হাতে তুলে নিলে। তখনো তার বুক কাঁপ্‌ছে। হাতের লেখাটি

দেখে তার একটু সন্দেহ হল। কিন্তু তার মন যার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষা করছে, তার ছাড়া এ চিঠি আর কারুর হতে পারে সে ভাব্‌তে পার্‌ছিল না। সে কম্পিত হাতে খামের মোড়কটা খুলে ফেল্‌লে। সম্বোধন, প্রথম লাইন ও ইতিতে নাম দেখে তার সন্দেহ আর মিথ্যা রইল না।—

চারুলেখা টুক্‌রো টুক্‌রো করে' চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে টেবিলে মাথা গুঁজে প'ড়ে রইল।

সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত এম্‌নি করে' মানুষের জীবনে এক একটা কেবল কান্নার দিন আসে।

চব্বিশ

সুধীর বল্লে—"আচ্ছা, আমি তবে যাই।"

ষ্টেশনমাষ্টার বল্লেন, "বিলক্ষণ! এই তোমায় এত করে' সব দেখাবার কষ্ট দিয়ে এখনি ছেড়ে দিচ্ছি আর কি? এই সমস্ত ঘোরাঘুরি করে' দেখিয়ে কি কম শ্রান্ত করেছি তোমায়!"

"আপনারাও তো শ্রান্ত হয়েছেন। এখন একটু বিশ্রাম কর্‌বেন না?" বলে' সুধীর সেবার মুখের দিকে চাইল। সেবার স্বাভাবিক উজ্জ্বল মুখে একটা ক্লান্ত বেদনার ছায়া পড়েছিল। সে কিন্তু কোনো কথা বল্‌লে না।

প্রৌঢ় কিন্তু কোনোমতেই ছাড়্‌লেন না, বল্লেন, "একটু বিশ্রাম না কর্‌লে যেতে দেব না।" তারপর শতমুখে সুধীরের ইঞ্জিনিয়ারিঙ্‌ কৌশলের প্রশংসা আরম্ভ কর্‌লেন।

সুধীর তার এরকম ও এর চেয়ে উচুদরের প্রশংসা

অনেক শুনেছে ও পড়েছে, কিন্তু আজ সামনের ওই নীরব মেয়েটির শ্রান্ত ঘর্মবিন্দুশোভিত মুখের দিকে চেয়ে এই প্রশংসার প্রেরণায় সে অনেক নতুন কথা ভাব্‌ছিল। এই দেশব্যাপী প্রশংসার এককণা সেখানে কি পৌছোয় নি? যে একদিন তার সামান্ত একটা খেল্‌না নির্ম্মাণের কৌশল দেখে আনন্দে অধীর হয়ে উঠ্‌ত, সেই চারুর অন্তরকে আজ তার এই অশেষ খ্যাতি কতটুকু নাড়া দেয়? সত্যি কি সে এত পর হয়ে গেছে তার কাছে? জীবন-দেবতার এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! কৈশোর যার সঙ্গে যার স্মৃতিতে যার স্পর্শে ভরপূর হয়ে রইল, যৌবন তার নাগালই পাবে না? এবং এ বিচ্ছেদ কি অসীম! কাল যদি উৎপল তাকে বিবাহ করে তা হলে তার কথা চিন্তাও হয়ত অন্যায় হবে।

সেবা ধীরে ধীরে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুধীর ভাব্‌তে লাগ্‌ল, আজ দেশ তার ললাটে যে গৌরবের টীকা পরিয়ে দিচ্ছে, এই গৌরব তার হৃদয়ের অসীম বুভুক্ষা মেটাতে পার্‌বে কি? খ্যাতির মূল্য যদি এই জীবনভরা হাহাকার হয়, তা হলে তার সামান্য প্রতিভা-হীন একটি বাংলার নগণ্য ছেলে হওয়া যে অনেক ভাল ছিল।

ষ্টেশনমাষ্টার টুপীটা মাথায় দিয়ে বল্লেন, "তুমি একটু বোস বাবা, আমি আফিসে একটু দেখা দিয়ে আসি। ততক্ষণ সেবাকে চায়ের জল চড়িয়ে দিতে বলে যাচ্ছি।"

আপত্তি নিষ্ফল হবে জেনে সুধীর সায় দিলে।

সেবা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "চায়ের সঙ্গে কি খাবেন? টোষ্ট কর্‌ব না পরোটা ভাজব?"

সুধীর তার ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, "আপনাকে আর এই ক্লান্ত শরীরে চা কর্‌তে হবে না। চা খেতে এখন ভালো লাগছে না।"

তারপর বল্লে, "আপনি আজ সমস্তক্ষণ একটিও কথা বলেন নি কেন, বলুন ত! কোনো অসুখ করেছে কি?"

"কই না! অসুখ কর্‌বে কেন? সেদিন আপনার কাছে অমন প্রগল্‌ভতা করেছি বলে' রোজই কর্‌ব, অত নির্লজ্জ আমায় ভাবছেন কেন?"

সুধীর ব্যথিত কণ্ঠে বল্লে, "সেদিন কি যে প্রগল্‌ভতা আপনি করেছিলেন যার জন্যে বারবার সে কথা তুলে আপনি নিজেকে ঘা দিচ্ছেন, আমি ত এখনো বুঝলুম না।"

"সিভ্যাল্‌রি দিয়ে সত্য কথাটা ঢাকা যায় বটে, কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"না, আপনার সঙ্গে পারা গেল না। আচ্ছা, আজ কি রকম দেখ্‌লেন বলুন।"

সেবা পাশের চেয়ারটায় বসে' পড়ে' বল্লে, "আমার মতো সামান্য লোকের প্রশংসায় কি যাবে আস্‌বে আপনার, আর আমি বুঝিই বা কি ?"

"আপনাদের মতো সামান্য লোকের প্রশংসা নিন্দায় পৃথিবীর অনেক কিছুই আসে যায়, এ আপ্‌নি ভালো রকমই জানেন।"

ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠে সেবা সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্লে, "আমাকে মাপ কর্‌বেন, কিন্তু সমস্ত দেখা-শোনার মাঝে আমার মনে ক্রমাগত যে লোকটির হাত মুখ কলে থেঁৎলে গেছে তার কথাই উঠ্‌ছিল। আমি ভালো করে' অন্য কিছু দেখ্‌তে পারিনি।"

সুধীর একটু বিস্মিত হয়ে বল্লে, "কিন্তু ওরকম তো আমাদেরই কাজে আরো কতজনের হয়েছে। ও সব ছোট দুঃখ দেখ্‌তে গেলে আর বড় কাজ করা চলে না।"

"কিন্তু ওই মানুষগুলোর দুঃখই ছোট, আর আপনার কাজ বড় সে-বিষয়ে যে এখনো আপনাদের মতো নিঃসংশয় হতে পারিনি।"

সুধীর অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে

বল্লে, "আপনারা সকলেই যে এক সুরে কথা কইতে আরম্ভ করে' দিলেন।"

"সকলেই মানে?"

"আমার এক পূর্ব্বেকার বন্ধুও ওই রকম কথা বলে।"

"আমার মনে হয় তিনি মিথ্যা বলেন না। এ সব দেখ্‌লে আমি মনে কেন জানি না আনন্দ পাই না। হয়ত এ আমার ভূল, কিন্তু ওই আপনাদের দরিদ্র কুলিদের অবস্থা দেখ্‌লে কি মনে হয় বলুন ত!"

সুধীর খানিকটা চুপ করে' থেকে বল্লে, "কিন্তু তাদের অবস্থার জন্যে কি আমরা দায়ী?"

"তর্ক কর্‌লে হয়ত আপনার দায়িত্বটা প্রমাণ কর্‌তে পার্‌ব না, কিন্তু অন্তর দিয়ে যে বুঝ্‌ছি আপনারাই দায়ী।"

সুধীর এবার হেসে বল্লে, "বা, তা হলে এই যে জড়শক্তিকে জয় করার চেষ্টা মানুষের, একে আপ্‌নি অন্যায় বল্‌তে চান?"

"এই শক্তি-অর্জ্জনকে অন্যায় বল্‌ছি না, কিন্তু এই যে শক্তির অন্যায় ব্যবহার যাতে মানুষের সুখের বদলে দুঃখই বাড়িয়ে দেয় সেই অন্যায় ব্যবহারকে নিন্দা কর্‌ছি।"

"দুঃখ যে বাড়্‌ছে, তার প্রমাণ তো আমি কিছু দেখ্‌ছি না।"

সেবা চুপ করে' রইল।

সুধীর বল্লে আবার, "যখন যন্ত্র ছিল না তখন কি সকলে ভয়ানক সুখে ছিল আপ্‌নি বল্‌তে চান্?"

সেবা ধীরস্বরে বল্লে, "আপনি যদি নিজে এই কুলীদের দুঃখ না দেখ্‌তে পান তাহলে আপনাকে তর্ক করে' তা বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা।"

সুধীর একটু রুক্ষ স্বরে বল্লে, "মাপ্‌ করবেন, কিন্তু আমার মনে হয় এই সমস্ত কথা শুধু শুন্‌তেই সুন্দর ও মধুর, তাই আপনাদের মতো যারা পৃথিবীর অন্তরের খোঁজ না রেখে স্বপ্ন নিয়েই কাটায়, তাদের মুখেই শোভা পায়!"

"আমার মনে হয় আমরা যদি স্বপ্ন দেখে থাকি, আপনারা দেখ্‌ছেন দুঃস্বপ্ন। আমাদের কথা শুন্‌তে মধুর আপনিই স্বীকার করছেন, কিন্তু আপনাদের কথা যে শুন্‌তেও কটু ও করুণ।"

খানিক থেমে সেবা উত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌তে লাগ্‌ল, "আপনিই তখন পঞ্চাশ জন কুলির জলের তোড়ে ভেসে পাহাড় থেকে পড়ে' যাবার কথা বলেছেন। এই পঞ্চাশ জনই যদি স্ব ইচ্ছায় কোনো গৌরবের জন্যে প্রাণ দিত তবে এই প্রাণ দেওয়ার ভেতর এত দুঃখ এ

বেদনা থাক্‌ত না। কিন্তু এরা প্রাণ দিলে যে যন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় তার গৌরবের এক কণা তাদের জন্যে কেউ পরিবেশন করবে কি? পেটের দায়ে অনাহারী থেকে নিজেকে বাঁচাতে তারা অসহায় ভাবে পশুর মতো প্রাণ দিলে, কিন্তু মানুষের মূল্য আপনাদের কাছে এত অল্প হয়ে গেছে যে এই প্রাণ নেবার লজ্জা এতটুকু আপনাদের বিচলিত করলে না। কোনো মহৎ অনুপ্রেরণায় তারা সে কাজে যায়নি, তাই তাদের দিক থেকে এই মৃত্যুটা এত করুণ এত ব্যর্থ এত অকারণ। আর শুধু ত এই পঞ্চাশ জন নয়, তাদের মতো আরো পাঁচশ জন যে ধীরে ধীরে জীবন ও জীবনের চেয়ে বড় জিনিষ তাদের মনুষ্যত্ব খোয়াচ্ছে। ঐ ত আপনাদের কুলিদের থাক্‌বার পল্লীটা দেখে এলুম, বলুন ত ওখানে পশুর মতো ছাড়া মানুষ থাক্‌তে পারে কি না। বিলেতে গোটাকতক নিষ্কর্ম্মা লোক বৎসরের শেষে শতকরা দু'শ টাকা লাভ করে স্ফূর্ত্তি করবে, আর তার জন্যে শুধু পশুর মতো খেটে মরবে শুধু দু'মুঠো ভাতের জন্য এখানে হাজার কুলী! জানি, বিশ্বজোড়া এই অবিচারের বিরুদ্ধে আমার মতো সামান্য একটা মেয়ের মুখের কথায় কিছু ফল হবে না, কিন্তু না বলে'ও পারিনা। আপনার কলকৌশলের

কথা ভাব্‌লেই তার সঙ্গে আমার মনে পড়ে ঐ হাত-মুখ থেঁৎলান কুলীটাকে। সমস্ত কুলীর দলকে আমি ওই লোকটির ভেতর দেখ্‌তে পাই। অমনি তাদের মনুষ্যত্ব থেঁৎলে বিকৃত পঙ্গু হয়ে গেছে।"

সুধীর কোন কথা বল্লে না।

সেবা স্বর নামিয়ে লজ্জিত ভাবে বল্লে, "আবার দেখুন অনেক বেশী কথা বলে' ফেল্লুম, কিন্তু কতবার আর ক্ষমা আশা করা যায় আপনার কাছে!"

"এ রকম বেশী কথার জন্যে আপনাকে সহস্র বার ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি, যদিও ক্ষমা করবার মত কি দোষ হয়েছে আমি জানি না। দেখুন, এ পর্য্যন্ত যন্ত্র-নির্ম্মাণই আমার তপস্যা ছিল, কিন্তু যন্ত্রের ব্যবহার নিয়ে মাথা কখনো ঘামাইনি, সুতরাং এদিক দিয়ে কথাটা বিশেষ করে' ভাবিনি কোনোদিন। তবু আমার এতে কি দোষ হয়েছে তা তো বুঝতে পার্‌লুম না। আমি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেই খালাস, তার ব্যবহার যদি অপরে অন্যায় ভাবে করে আমি তার কি করতে পারি! আপনি কি বলেন আমি এ কাজ ছেড়ে দেব?"

সেবা বল্লে, "সে কথা আপ্‌নাকে আমি বল্‌তে যাব কেন, কোন্ অধিকারে?"

সুধীর অপ্রতিভ হয়ে বল্লে, "না না, আমি শুধু বল্‌ছি আপনার মতে আমার এমন কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত কি ?"

"সে মতামত আপনি ঠিক করবেন।" তারপর হেসে সেবা বল্লে, "আমি ত শুধু খানিকটা বাহাদুরী করে' বক্তৃতা দিলাম বই ত নয়।"

"বাহাদুরী করে' বা যাই করে' হোক্, এমন বক্তৃতা দিয়েছেন যে আমাকে দস্তুর মতো নাড়া খেতে হয়েছে। বাঙালীর মেয়েরা এসব কথা ভাবে আমি জানতুম না।"

সেবা লজ্জিত হয়ে বল্লে, "আমার মুখে এই গোটাকতক মামুলী কথা শুনেই যখন এত তারিফ্ করছেন, তখন বাঙালীর মেয়ে সম্বন্ধে আপনার অজ্ঞতা খুব বেশী বল্‌তে হবে।"

"তা নয়, তবে মেয়েদের সম্বন্ধেই আমার অজ্ঞতা খুব বেশী বটে, আমি তাদের বুঝ্‌তে পারি না।" বলে' সুধীর অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

"তারা কি ইঞ্জিনিয়ারিঙ্ প্রব্লেমের চেয়েও জটিল ?"

"আমার ত মনে হয় অনেক বেশী।"

"কোনোদিন বুঝি সমাধান করতে গিয়ে বিফল হয়েছেন ?" বলেই সেবা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু

সে লজ্জা একটুও লক্ষ্য না করে' সুধীর বল্লে, "সে কথা যাক্, কিন্তু আমি ত এই কুলী মজুরদের দুঃখ দূর করবার কোনো পথ দেখতে পাই না। তাদের দুঃখকে যতদিন স্বাভাবিক উপায়হীন ভাগ্যদোষ বলে' ভুল করেছি ততদিন কোনো বালাই ছিল না, কিন্তু আজ আপনি যখন আমাদের তাদের দুঃখের জন্যে দায়ী করলেন তখন ত আর একেবারে এড়িয়ে যেতে পারি না।"

সেবা বল্লে, "না, আমি অনেক বাজে বকেছি, আর দুর্ব্বলতা প্রকাশ করতে চাই না।"

সুধীর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, "আচ্ছা, আজ আপনি শ্রান্ত আছেন, আজ থাক্, কিন্তু আর একদিন আপনাকে ছাড়ব না বলে' রাখ্ছি। এখন আসি।"

"বাবা কিন্তু আপনাকে বসতে বলে' গেছ্লেন।"

"তাঁর কাছে আমার ক্ষমা ভিক্ষা জানাবেন। আর থাকতে পারি না।" বলে' সুধীর বেরিয়ে গেল।

পঁচিশ

আগের দিন হিন্দুস্থানী আর পাঞ্জাবী কুলীদের মধ্যে একটা বিষম মারপিট্ হয়ে গেছ্ল। দুপক্ষের বিচার কর্তে সুধীর আর ম্যানেজার সাহেব সেখানে গেছ্লেন। সুধীর সেখানে গিয়ে মারপিটের কারণ শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এর আগে পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানীদের মধ্যে ছোটখাট অনেক ঝগড়া হয়ে গেছ্ল কিন্তু এমন রক্তারক্তি ব্যাপার কখনো হয়নি। তিনজনের মাথা ফেটে গেছ্ল গুরুতর আঘাত খেয়ে এবং আরো জন বিশেক দু'পক্ষের কম বেশী আঘাত খেয়ে শয্যাশায়ী হয়েছিল।

দু'পক্ষের ওকালতির মধ্যে সত্য মিথ্যা নিরূপণ করা শক্ত হলেও জানা গেল যে একজন পাঞ্জাবী কুলী সস্ত্রীক বাস করত ও স্ত্রীর ওপর নাকি ভয়ানক অত্যাচার করত। হিন্দুস্থানী কুলীরা বলে তাদের একজন সেই প্রহৃতা স্ত্রীর কার শুনে বাধা দিতে যাওয়া থেকে বচসা হয়েই এই

মারপিটের সূত্রপাত, আর পাঞ্জাবী কুলীরা বলে, একজন হিন্দুস্থানী কুলী তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়, তারপর তারা খুঁজে বার করার পর তারা তাকে ছাড়্তে না চাওয়ায় এই মারপিটের সূচনা। যে স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে এই কাণ্ড, তার বয়স বছর ত্রিশ হবে, একটা চোখ কানা ও মুখময় বসন্তের দাগ। তাকে জিজ্ঞাসা করে' কোন কথা পাওয়া গেল না। সে ক্রমাগত বসে' বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদ্তেই ব্যস্ত। যে হিন্দুস্থানীর নামে মেয়েমানুষটিকে নিয়ে পালিয়ে যাবার অভিযোগ ছিল তাকে পাওয়া গেল না। স্ত্রীলোকটির স্বামীকে তলব কর্‌লে একজন পাঞ্জাবী বল্লে, সে কাল রাত্রেই কলেরায় মারা গেছে এবং তার সেই কলেরা হবার সময়ই সুযোগ পেয়ে হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে যাবার সুবিধা পেয়েছে!

সুধীর জিজ্ঞেস কর্‌লে, "কলেরা? এখানে কলেরা হচ্ছে নাকি?"

তারা বল্লে, "কেন, আজ চার পাঁচ দিন হ'তে কলেরা আরম্ভ হয়েছে। এর মধ্যেই জন দশেক সাবাড় হয়ে গেছে—"

সুধীর অবাক হয়ে ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কলেরা হয়েছে সে কথা ত আমরা কেউ জানি না।"

ম্যানেজার বল্লে, "ওদের কলেরা ফলেরা ত হামেশাই হচ্ছে, তার জন্যে আর ঢেঁড়া পিটে বেড়ান যায় না।"

সুধীর ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লে, "ঢেঁড়া পিটে বেড়ান যায় না, কিন্তু কি ব্যবস্থা হয়েছে শুনি!"

ভ্রূকুটি করে' ম্যানেজার বল্লে, "সে ওদের ঠিকাদার জানে, আমরা তার কি করব!"

সুধীর বিরক্ত মুখে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠিকাদার কোথায়?"

ঠিকাদার নতুন কুলী আনতে বেরিয়ে গেছে, চার পাঁচ দিন পরে আসবে জানা গেল। সুধীর জিজ্ঞাসা করে' জানলে এই সমস্ত কুলী অন্য সব বিষয়ে তাদের অধীন হলেও টাকা কড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে ঠিকাদারের অধীনে। ঠিকাদারই তাদের নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করে' আনে ও মাইনে ইত্যাদি দেওয়ার সেই মালিক। কি ওষুধ দেওয়া হয়েছে জানতে চাওয়ায় তারা বল্লে, বিলিতি দাওয়াইতে তারা বিশ্বাস করে না, তাদের মধ্যে একজন মন্ত্র-টন্ত্র জানে তাকে দিয়েই ঝাড়ফুক করিয়েছে।

সুধীর প্রথমে দূর থেকে এই মজুরদের দুঃখের দায়িত্ব ভাগ্যের ওপর ফেলে নিশ্চিন্ত ছিল এবং সেদিন সেবার ধায় সে মনোভাবের কিছু পরিবর্তন না হলেও মজুরদের

দুর্দ্দশার পরিমাণ যে কত তা কোনো দিন জানবার চেষ্টা করেনি। শুধু বাইরের দারিদ্র্য ছাড়া তাদের মনের অন্ধকার যে এত বেশী ও নীতিজ্ঞানের যে এত অভাব তা সে কোনো দিন ভাবেনি। প্রমাণাভাবে বিচারে কিছু সাব্যস্ত করতে না পেরে ম্যানেজার-সাহেব চলে' গেলেন। সুধীর কিন্তু কুলীদের বল্লে, "কই, কাদের কাদের ঘরে কলেরা হয়েছে নিয়ে চল ত।"

তারা বেশ একটু অবাক্ হয়েই সুধীরকে নিয়ে প্রথম যেখানে গেল সে ঘরের ও ঘরের রোগীর অবস্থা দেখে সুধীর আশ্চর্য্য হয়ে গেল। একটা ছেঁড়া নোংরা চাদরের ওপর পড়ে' মল ও বমনে মাখা হয়ে কুলীটি ছট্‌ফট্ করছিল। অতি ক্ষুদ্র ঘর, পাশেই হাড়িকুঁড়ি ও পিতলের একটা থালা। একটা মাটীর কলসী ছিল, কিন্তু সেটা কোন রকমে পড়ে' ভেঙ্গে গেছে, জল মেঝেময় গড়িয়ে গেছে। তাদের আসতে দেখে লোকটা ক্ষীণ স্বরে জল বলে' চীৎকার করবার চেষ্টা করলে। ঘরটা থেকে অসহ্য দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল। একজনকে জল আনতে পাঠিয়ে সুধীর জিজ্ঞাসা করলে "কখন হয়েছে?"

লোকটা তার কোন উত্তর না দিয়ে ছট্‌ফট্ করতে করতে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে তাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবার

জন্য অনুরোধ করতে লাগল, সেখানে তার মা আছে, বৌ আছে, সে আর বাঁচবে না। একবার শেষ তাদের দেখতে চায়। বেহারের কোন গাঁয়ে তার বাড়ী, সুতরাং তাকে বাড়ী পাঠান অসম্ভব। সুধীর বল্লে, "ভয় কি, তুমি সেরে যাবে, আবার তোমার বাড়ীতে যাবে।" কিন্তু এই মিথ্যা সান্ত্বনা তার গলা যেন চিরে বেরুল। তাকে জল খাওয়াতে গিয়ে সুধীর জলের চেহারা দেখে যে জল এনেছিল তাকে এক ধমক দিয়ে বল্ল, "বদ্‌মাস্ এই কি খাবার জল এনেছিস্! আক্কেল নেই পাজী?"

সে ক্ষুণ্ণস্বরে বল্লে যে ঐ জলই ত তারা খেয়ে থাকে, ওর চেয়ে ভালো জল তারা কোথায় পাবে? সাহেব আর বাবুদের জন্য দশ মাইল দূর থেকে যে জল আসে সে জল ত আর তাদের নয়।

সুধীরের স্মরণ হল সত্যিই ত, সে ভালো জল ত শুধু বাবুদের জন্য ঝর্ণা থেকে আসে। কুলীরা এখানকার কোন্ ডোবার জল খায় সে জান্‌ত, কিন্তু সে ডোবার জল যে এমন ভয়ানক, এ সে জান্‌ত না। অযত্নসম্ভূত অরণ্যের ডোবার পাতাপচা জল যেমন দুর্গন্ধ তেমন অস্বাস্থ্যকর, স্বাদও বোধ হয় তার তেমনি। লোকটা 'জল জল' বলে' চীৎকার করছিল। অগত্যা সুধীর তাকে সেই জলই

খেতে দিলে। তার মনে হচ্ছিল সে নিজ হাতে ওই মরণাপন্ন লোকটির মুখে বিষের পাত্র ধরেছে।

সুধীর সমবেত কুলীদের বল্লে, "তোমরা এ রকম জল খাও কেন? নালিশ করতে পার না?"

একজন হেসে বল্লে, "গরীবের অত বাবুয়ানীর দাবী কখনো চলে?"

অসুস্থ লোকটার কাছে একজনকে থাকতে বলায় কেউ রাজী হ'ল না। আরো পাঁচজন এই রকম আক্রান্ত হয়েছে শুনে সে বরাবর ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বল্লে, "পাঁচ পাঁচ জনের রোগ হয়েছে, দিন দিন নতুন লোককে রোগে ধরছে, এর কি একটা ব্যবস্থা হবে না?"

ম্যানেজার সুধীরের অনধিকার চর্চ্চায় বেশ ক্রুদ্ধ হয়ে জবাব দিলে, ওসব বাজে কাজ নিয়ে মাথা ঘামানোর তার সময় নেই, ঠিকাদার আসলে যা হয় বন্দোবস্ত করবে।

সুধীর বল্লে, "কিন্তু ঠিকাদার আসবার আগেই যে এরা মারা পড়বে, তার কি?"

ম্যানেজার বল্লে, "আমি কি করতে পারি? ডাক্তার বাবুর কাছে যাও।"

সুধীর রেগে বল্লে, "কিছু না পার ওদের জন্যে একটু ভালো খাবার জলের বন্দোবস্ত করে' দিতে হবে।"

ম্যানেজার এবার রেগে বল্লে, "অত দরদ্ থাকে নিজের জলের ভাগ থেকে দাও গে, ক্যাম্পের জল দিয়েই কুলিয়ে উঠ্‌তে পারা যায় না, আবার কুলীদের বাড়্‌তি জল কোথা থেকে দেওয়া যায়।" সত্যই জল দেওয়াটা একটু কঠিন ছিল। ক্যাম্প থেকে ঝর্ণা দশ মাইল, সেখান থেকে লোক দিয়ে জল আনানো বিশেষ কষ্টসাধ্য।

"নিজের থেকে দেব সে তোমায় বল্‌তে হবে না। কিন্তু তুমি এমন স্বার্থপর কুকুর তা জান্‌তুম না।" বলে' সুধীর বেরিয়ে গেল।

ম্যানেজার সাহেব নিরুপায় রাগে গর্জ্জাতে লাগ্‌ল। সুধীরের শক্তির পরিচয় পাবার সৌভাগ্য তার আগে হয়েছিল।

একদিন সে যাদের সম্বন্ধে অজ্ঞানে অন্ধ হয়েছিল, আজ বিধাতা যেন তাদের সম্বন্ধে তার একদিনেই চোখ ফুটিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন চারিদিক থেকে আঘাত দিয়ে।

ডাক্তারকে অনেক বলে'-ক'য়ে রোগী দেখাতে রাজী করান গেল বটে, কিন্তু ডাক্তার মধ্যাহ্নভোজন করে' একটু বিশ্রাম না করে' যেতে চাইলেন না কিছুতেই। সুধীর নিজের ক্যাম্পে গিয়ে নিজের ব্যবহারের জলের অধিকাংশ

একজন লোক দিয়ে অসুস্থদের মধ্যে বিলি করবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে একটা চেয়ারে শ্রান্ত হয়ে বসে' পড়ল। রাগে দুঃখে ওই গরীবদের জন্যের কথা চিন্তা করে' হতাশায় তার মনে এক বিপুল আলোড়ন চল্‌ছিল। আর সেবার প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন এই সঙ্গে ভরে' যাচ্ছিল। সে এতদিন সাম্‌নে থেকেও যা দেখ্‌তে পায়নি, সেবা এক দিনের দৃষ্টিতেই কিন্তু তা সব বুঝে নিয়েছিল।

এই সাতশ' আটশ' কুলীর ব্যবস্থাও যে কি করা যেতে পারে সে ভেবে পাচ্ছিল না। চার জনের খাবার জল না হয় সে দিলে, কিন্তু এই আটশ' কুলীর জল কোথা থেকে আস্‌বে? অথচ এই রোগের সময় ওই দূষিত জল খেলে তাদের কি অবস্থা হবে সে কল্পনা করা বিশেষ কঠিন নয়। সত্যি কোন উপায় নেই ..

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন সে ডাক্তারকে নিয়ে কুলীদের পল্লীতে গেল তখন তার প্রথম দেখা লোকটি মারা গেছে, আর চার জনের অবস্থাও আশাহীন। আরো দু' একজনের রোগ হওয়ার সংবাদও পাওয়া গেল।

বাইরে সুধীরের ডাক শুনে সেরা তাড়াতাড়ি অর্দ্ধেক আঁকা ছবিখানা লুকিয়ে দর্‌জা খুলে দিয়ে বল্লে, "বাবা ত বাড়ী নেই, আফিসে আছেন।"

"আচ্ছা, আমি বস্‌ছি, আর আপনার সঙ্গেই আমার কথা আছে।" বলে' সুধীর ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে' পড়্‌ল।

সেবা একটু বিস্মিত হয়ে বল্লে, "আমার সঙ্গে ?"

সুধীর হেসে বল্লে, "হ্যাঁ আপনাদের কাছে বিদায় নিতে এলুম, কাজ ছেড়ে দিয়েছি।" সেবার বিমূঢ় দৃষ্টি লক্ষ্য করে সে আবার বল্লে, "না ঠাট্টা না, সত্যি ছেড়ে দিয়েছি, আর এখান থেকে কালই যাচ্ছি।"

সেবা এতক্ষণ বাদে বল্‌তে পার্‌লে—"কেন ?"

"নিশ্চেষ্ট নিরুপায় হ'য়ে চোখের সামনে অসহায় মানুষের যন্ত্রণা দেখতে পারব না বলে'।"

সেবাকে নির্ব্বাক দেখে সুধীর আরো বল্লে, "যাবার আগে আপনাকে একটু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যেতে চাই। আপনি ঘা না দিলে আরো কত দিন এই নিষ্ঠুরতার সহায়তা করতুম অজান্‌তে, বল্‌তে পারি না।"

সেবা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, "এতদিন বাদে হঠাৎ এক-দিনেই আপনার এমন পরিবর্ত্তন হয়ে গেল যে ?"

"যখন মানুষের হুঁস হয় এম্‌নি করেই হয়। পাহাড় যখন ধসে' পড়ে, তখন হঠাৎ এম্‌নি অতর্কিত ভাবেই ড়ে।"

"কিন্তু তার আগে তার ভিৎ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়েছে জান্‌বেন।"

"হাঁ, ধীরে ধীরে কিন্তু অলক্ষ্যে। আমার ভেতরও অলক্ষ্যে এই মিথ্যা বিশ্বাসের ভিৎ ক্ষয় হচ্ছিল নিশ্চয়।"

পশ্চিমের জান্‌লা দিয়ে পড়ন্ত রোদ এসে সুধীরের মুখে পড়্‌ছিল। সেবা উঠে জান্‌লাটা বন্ধ করে' দিয়ে চেয়ারের হাতলটা ধরে' দাঁড়িয়ে বল্লে, "আপনি কালই যাচ্ছেন?"

"কালই সকালে।"

দুজনে নীরব হয়ে রইল কিছুক্ষণ। দূর থেকে একটা ট্রেণ আস্‌বার শব্দ আস্‌ছিল। তার তীক্ষ্ণ হুইসিলের আওয়াজে আকাশ যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

টেবিলের ওপর একটা কুনুই রেখে হাতে মাথার ভর দিয়ে সুধীর ব্যথিত হয়ে অনেকটা আপনমনে বল্‌তে লাগ্‌ল, "কালই চলে' যাচ্ছি, কিন্তু কত বড় শূন্যতা বুকে নিয়ে যাচ্ছি তা যদি কাউকে বোঝাতে পার্‌তুম..."

সেবার দিকে সুধীরের চোখ্‌ ছিল না, তবু সেবা কি ভেবে একবার চম্‌কে উঠ্‌ল!

"...জীবনের সমস্ত দুঃখ বঞ্চনার মাঝে যে সাধনাকে আঁকড়ে ধরে' সব ভুল্‌তে চেয়েছিলুম, সে সাধনাও আজ শেষ হয়ে গেল। সে সাধনার আড়ালে এত মানুষের

চোখের জল এত দরিদ্রের হাহাকার অলক্ষ্যে জমে' উঠ্‌ছিল তা ত জানি না। কিন্তু আজ অন্তরে বাইরে আশ্রয় নেবার আর কিছু রইল না। আমার চিরকালের যা একমাত্র ধ্যান, যা আমার জীবনের সঙ্গে শিরায় উপশিরায় জড়িয়ে আছে, যার ভরসায় ভাগ্যের নিষ্ঠুরতম আঘাতকেও তুচ্ছ করব ভেবেছিলুম সেই ধ্যান ছেড়ে কি কর্‌ব আমি? হাতে যে রক্ত লাগিয়েছি, সে রক্ত ধোব কোথায়? সংসার যে সব দিক থেকে আমায় ঠেলে বার করে' দিলে।"

সেবা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে তবু নীরব হয়ে রইল।

সুধীর আবার বল্‌তে লাগ্‌ল, "যৌবনের মাঝে এসে জান্‌লুম, এতদিন যা করেছি যা ভেবেছি সব ভুল, যা বিশ্বাস করেছি সমস্ত মিথ্যা ভুয়ো, যা কিছু আশা করেছি সমস্ত মরীচিকা। দেবতা জেনে যার অর্চ্চনা করলুম সমস্ত জীবন, তার ভেতর থেকে দানবের অট্টহাসি উঠ্‌ল আজ। বলুন আমি ভবিষ্যতে কি সম্বল নিয়ে ভরসা করে' তাকাব?"

মুখ ফিরিয়ে সেবার চোখের অন্যমনস্ক দৃষ্টি লক্ষ্য করে' সুধীর বল্লে, "আপনাকে এ সব কথা বলে' অকারণে বিরক্ত কর্‌ছি হয়ত, কিন্তু কাউকে না বলে'ও যে আর পারি না। তা ছাড়া আপনারা প্রথম আলাপ থেকে আমার সঙ্গে যে-রকম সদয় ব্যবহার করেছেন—"

এইবার সেবা বল্লে, "কিন্তু দুঃখ দেখে পালিয়ে যাওয়াটাই কি উচিত কাজ হবে ?"

"সে আমি ভেবে দেখেছি অনেক। কোন উপায় নেই পঞ্চাশজন কুলী আমার সামনে জল জল বলে চীৎকার কর মরেছে, জলের নামে তাদের যা দিয়েছি তা যদি দেখাে পারতুম বুঝ্ তে পার্তেন। তাদের শবগুলো পর্য্যন্ত সৎকা কর্বার উপায় নেই! ঘরে ঘরে রোগ লেগেছে, ও রোগে মড়া কে ছোঁবে ? বনের ভেতর টেনে ফেলে দিতে হয়েছে আর এই মহামারী যখন তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে, তাদে মাঝে যারা সুস্থ আছে তারা সস্তা মদ নিয়ে সে কি বীভৎ উল্লাসে মেতেছে! তার মাঝে একটি স্ত্রীলোককে দেখ্লুম। আগের দিন তার স্বামী কলেরায় মারা গে আর তাকে নিয়ে কুলীদের ভেতর রক্তারক্তি হয়ে গেছে কিন্তু কোন উপায় নেই। চোখের সাম্নে অমন ব্যাপ দেখ্তে পারা যায় না। না, যেতেই হোল।"

সেবা কি একটা কথা বল্তে গিয়ে বল্লেনা বা বল্ পার্লে না।

সুধীর বল্লে, "আপনাদের সঙ্গে হয়ত আর দেখা কথ হবে না, কিন্তু এই ক'মাসের আলাপে আপনি আপনা অজ্ঞাতে আমার জীবনে অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তন